গায়ে হলুদ

শ্রীদীনেশ চন্দ্র সেন

১৩২৭

উপহার পত্র

উৎসর্গ

পরম কল্যাণীয়া

শ্রীমতী শচীরাণী দেবীকে

এই বইখানি দিয়া

আশীর্ব্বাদ করিলাম।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

ভূমিকা

ছোট্ট কনে বউদের জন্য এই বইখানি লেখা হয়েছে। বাপমায়ের জন্য যাদের চোখের জল এখনও শুকায়নি —মাথায় ঘোমটা রাখার অভ্যাসটা যাদের এখনও ঠিক আয়ত্ত হয়নি,—খাট সুরে কথা বলতে যাদের বাধ বাধ ঠেকে—বাল্য-লীলার শত শত কথা যাদের এখনও ঘিরে রেখেছে—সেই নূতন বউদের হাতে দেবার মতন করে আমি এই বইখানি লিখেছি। শ্বশুর বাড়ীতে গিয়ে নিজের জায়গা জুড়ে বসে বধূ আমার "গৃহশ্রী" খানি পড়বেন। কিন্তু এ বইখানি যখন হাতে দিতে চাচ্ছি, তখন শ্বশুর বাড়ী বউএর কাছে মস্ত একটা প্রহেলিকা। সেই নূতন জায়গায় যেয়ে প্রথম হ'তে কিরূপে চল্‌তে হবে—এই বইখানিতে তাই বলা হয়েছে। হিন্দুর ঘরের লক্ষ্মী যখন চঞ্চল প্রকৃতিটি সংবরণ ক'রে নূতন গৃহে স্নেহের পদ্মাসনে স্থির হয়ে বস্‌বেন, এই আমার অর্ঘ্য তখন যদি তিনি প্রীতির চক্ষে দেখেন তবেই আমার শ্রম সার্থক। "গৃহশ্রী" মেয়েরা যত্ন ক'রে পড়ছেন, এটি আমি জান্‌তে পেরেছি। তাঁদের বাসরে, আরাম-প্রকোষ্ঠে, নবজাত শিশুর বালিসের

কাছে, হেঁসেলে সর্ব্বত্র "গৃহশ্রী" দেখ্‌তে পেয়েছি, তা' না হ'লে তিন বৎসরে ছয়টী সংস্করণের দরকার কি ক'রে হতে পারে ?

কিন্তু "গায়ে-হলুদ" ঠিক বিয়ের কনেকে দেওয়ারই জন্য হয়েছে। যদি শুরু থেকে নূতন বউ আমার কথা মত চল্‌তে পারেন তবে তিনি লক্ষ্মীটি হবেন।

যাঁর নামে এই বই দেওয়া হ'ল, তাঁর বিয়ের পূর্ব্বেই বইখানি লেখা হয়েছিল, কিন্তু তাড়াতাড়ি ছাপা শেষ কর্‌তে পারি নাই। এই জন্য আমার "আশীর্ব্বাদ"টি দিতে দেরি হয়ে গেল।

বেহালা, ২৪শ পরগণা
১৩ই আষাঢ়, ১৩২৭ } শ্রীদীনেশ চন্দ্র সেন

সূচীপত্র

ছবির সূচী

গায়ে হলুদ

হঠাৎ নূতন জায়গায়

তুমি তো শ্বশুর বাড়ী চল্লে। তোমার ছোট বড় ভাই বোনদের ফেলে, তোমার বাপ মাকে ফেলে, তোমার সাথীদের ফেলে,—তোমার এই খেলা-বেড়ার পথ ঘাট ফেলে—জানা শোনা সব জিনিষ ফেলে চল্লে এক অজানা অচেনা রাজ্যে। তোমার মনের ভাবটি আমি কতকটা বুঝ্তে পাচ্ছি। তোমার মনের ভিতর যে একটা ভয় না হচ্ছে, তা' নয়। এখন ক্ষুধা হোলে চেয়ে খেতে পার্বে না; নিজে ভাঁড়ার ঘরে গিয়ে এটুকু ওটুকু মুখে দিতে পার্বে না; যার তার সাম্নে বার হোতে পার্বে না,

ছুটোছুটি করতে পারবে না; গু'ণে গু'ণে পা' ফেলতে হবে; শাড়ীটায় সমস্ত শরীর ঢেকে—ঘোমটায় মুখখানি আড়াল কোরে ঠিক জ্যান্ত একটি পুতলিন্দা হোয়ে ব'সে থাকতে হবে। আর সবার চাইতে বিপদ, তোমার দিকে একশ চোক চেয়ে থাকবে। এখানে তুমি কি কোচ্ছ না কোচ্ছ, তার খবর কে রাখে? কিন্তু সেখানে তুমি একটু হাই তুললে তা' নিয়ে কথা হবে। কিরূপে হাসতে হবে, কিরূপে পা' ফেলতে হবে, কিরূপে ভাতের গ্রাসটি পর্য্যন্ত মুখে তুলতে হবে—তা তোমায় নূতন কোরে শিখতে হবে। এখানে পাশের বাড়ীর হরিদাসী এসে তোমায় ডাকলে যেমন তুমি ছুটে গিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধ'রে প্রত্যেক কথায় হেসে ঢ'লে প'ড়, —এ পাড়া হোতে ও পাড়া, এ বাড়ী হোতে ও বাড়ী ছুটোছুটি কোরে বেড়াও—সেখানে তার কিছু পারবে না। সেখানে কথা ব'লবার লোক খুঁজে পাওয়া কঠিন হ'বে; সারাদিন কেবলই ঘাড় নেড়ে মনের কথা বুঝতে হবে। দুই একটি সঙ্গিনী পেলে ও

ছোট ছোট ছেলে মেয়ে দেখ্‌লে, তাদের সঙ্গে হয়ত কথা বল্‌তে পাবে, কিন্তু ফিস্‌ ফিস্‌ কোরে। গলা ছেড়ে কথা বল্‌বার পালা তোমার একরকম শেষ হোয়ে গেল।

সে কালের কথা

কিন্তু পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে তোমার চাইতেও ঢের ছোট ছোট মেয়েদের বিয়ে হোত। তাদের দশা একবার ভেবে দে'খ। তারা ঘোম্‌টা-টা নিয়ে প্রথম প্রথম বেশ আমোদ বোধ করত। হয়ত সেটা টেনে মুখের উপর অনেকটা বাড়িয়ে দিলে, তখন চোখে কিছুই দেখ্‌তে পেল না। সেই অবস্থায় হেঁটে যেতে খাটের ধাক্কা খেয়ে ফিরে এল। কখনও বা ঘোম্‌টা ছোট করে দিয়ে, মুখখানি সব ঢেকে আঙুল দিয়ে ঘোম্‌টা টি সরিয়ে—একটা মাত্র চোখ খুলে, তাই দিয়ে লোক জন সব দেখ্‌তে লাগ্‌ল,—ঘোমটাটা

তার খেলার জিনিষ হোয়ে দাঁড়াল। প্রথম প্রথম সে ভারি মজা পেল ; কিন্তু সে খেলার সখ্‌টা বেশী দিন রইল না। হয়ত একটু ছুটে আস্‌ছে, বাড়ীর বুড় ঠানদিদি তাড়া দিলেন। মাথার ঘোম্‌টাটা খুলে একটু ব'সে আছে, পাড়ার এক বুড় মাসী এসে ব'লে গেলেন বউএর লজ্জা সরম নেই। বউএর বয়স কিন্তু তখন ছয় কি সাত। বউএর ক্ষুধা পেলে দুটি চোখ জলে ভেসে যেত, তখন মায়ের কাছে যেয়ে গলা জড়িয়ে ধ'রে কাঁদবার ইচ্ছা হোত। ছেলে মেয়েরা এবাড়ী ওবাড়ী ছুটোছুটি ক'রে খেলা করছে দেখে তারও তাদের একজন হোয়ে খেলতে সাধ হোত। এতগুলি দুঃখ ও ইচ্ছা তাকে চেপে রাখ্‌তে হোত ! সেই এতটুকু মেয়ের যে কি কষ্ট হোত, তা' তোমরা বুঝ্‌তে পার। চোখের জল দেখ্‌লে শাসন, কোন লোকের দিকে চাইতে দেখ্‌লে শাসন, পুকুরে জল আন্‌তে গিয়ে সঙ্গিনী কারু সঙ্গে আলাপের সময় একটু জোরে হাস্‌লে শাসন,—তার কাজকর্ম্ম চলাফেরা

কথাবার্ত্তা সবই অতি অপরাধীর মত তাকে কর্‌তে হোত।

তার একটি মাত্র সান্ত্বনার জায়গা ছিল। সে ঘুমুবার ঘরটিতে যেয়ে "মা" "মা" বলে লুটোপুটি ক'রে কাঁদতে থাক্‌তো। সে কিছু বলে ক'য়ে শোক প্রকাশ কর্‌ত না; সব্বাই ঘুমিয়ে পোলে সে "মা" "মা" ব'লে কাঁদতে কাঁদতে অবসন্ন হোয়ে শেষে নিজে ঘুমিয়ে পড়ত।

আগমনী গান—দুর্গাপুজা

সেই সময় ছোট মেয়েদের শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে তাদের মা বাপ কিরূপে ঘরে থাক্‌তেন, তা যদি তুমি আগমনী গান শুনে থাক, তবে কতকটা বুঝ্‌তে পারবে। শিবের ঘরে আট বছরের গৌরী গেছেন। শিব পাগল, কত কষ্টে গৌরী ঘরকন্না করছেন, ভাব্‌তে মা মেনকা রাণীর দুটি চোখ জলে ভেসে

যেত। কোনো গানে তিনি স্বামী গিরিরাজকে কৈলাসে পাঠিয়ে দিচ্ছেন, কেঁদে কেঁদে বল্‌ছেন, "আজ আমি স্বপ্নে দেখলুম, গৌরী 'মা' 'মা' ব'লে কাঁদ্‌ছে।" কোনো গানে তিনি বল্‌ছেন, "তুমি শিবকে এখানে নিয়ে এস, আমি তাকে ঘর জামাই কোরে রাখ্‌ব। তা' হোলে আমি বারমাস তাদের দেখ্‌তে পাব—তোমাকে বছর বছর শরৎকালে গিয়ে তাদের আন্‌তে হবে না।" কোনো গানে বল্‌ছেন—"নারদ আমায় সব ব'লে গেছে, শিব ভাঙ্গ খেয়ে তাকে কত কটু কথা বল্‌তে থাকে—বিয়ের সময় গৌরীকে যে সকল কাপড় ও গহনা দিয়েছিলুম, শিব তা' সমস্ত বেচে সাবাড় ক'রে দিয়েছে।" শরৎকালে যখন বৈষ্ণব ভিখারীরা সারেঙ্গ বাজিয়ে মেনকামায়ের এই সকল বিলাপের কথা গাইতো, তখন বঙ্গদেশের পাড়াগাঁয়ের সমস্ত মায়ের প্রাণ সাড়া দিয়ে কেঁদে উঠতো; কারণ সেই সকল গান তাদেরই প্রাণের কথা, সে গুলি তাদেরই চোখের জলে গড়া, বৈষ্ণব ভিখারী তা সুরে গাইত মাত্র।

❋ গায়ে হলুদ ❋

এই ছোট্ট ছোট্ট মেয়েরা যখন শ্বশুরবাড়ী যেত তখন মা, বাপ, ভাই-বোনের মনে কত কষ্ট হোত, সেই কষ্টের কথা পুরাণো অনেক ছড়ায় পাওয়া যায়। বাপ কাঁদ্‌ছেন; গামছা দিয়ে চোখ মুচ্‌ছেন —এদিকে মেয়ে বেচে যে পণের টাকা পেয়েছেন, তা তুলে রাখ্‌ছেন। মা গলা ছেড়ে কাঁদ্‌ছেন; যে বোন দিনরাত ঝগড়া করতো, তাকে গালাগালি দিত, সে আজ খাটের পায়া ধোরে কাঁদ্‌ছে। মেয়ে যাবার সময় মাকে বল্‌ছে, "আমায় দিও না।" মা কেঁদে বল্‌ছেন—"সভার মধ্যে টাকা নিয়ে বিয়ে দিয়েছি, তোমায় কেমন কোরে রাখ্‌বো?"

তখন আত্মীয়েরা ছেড়ে দিল। সমুদ্রের জলে যেমন একটা খড় কুটো ভেসে যায়, অজানা রাজ্যের অচেনা স্থানে ছোট্ট বউটি তেমনই ভেসে চল্ল। পুরাণা ছড়ায় আছে, বালিকা মাঝিকে বল্‌ছে—"নৌকাখানি ভাঙ্গা, মাদারের ডাল দিয়ে বৈঠা তৈরী হোয়েছে, নদীর জলে নৌকা চল্‌ছে, কিন্তু চলকে চলকে জল উঠ্‌ছে—মাঝি ভাই আমার বড় ভয়

হোচ্ছে।" আবার বল্‌ছে, "মাঝি একটু ধীরে ধীরে নৌকাখানি বেয়ে যাও, আমার মা মাটিতে প'ড়ে গলা ছেড়ে কাঁদ্‌ছেন, আমি একটু শুন্‌ব, অত তাড়াতাড়ি যেও না।" এই ছোট্ট বউটির দুঃখে সমস্ত পাড়াগাঁয়ের প্রাণ কেঁদে উঠতো। ছড়াগুলি পড়্‌লে তা স্পষ্ট বোঝা যায়।

তুমি তো দুর্গাপূজা দেখেছ। এই দুর্গাপূজার অর্থ কি? বছর ভরে কষ্ট স'য়ে মেয়ে বাপের বাড়ী আস্‌ছে। মাত্র তিনটি দিনের ছুটি পেয়ে আস্‌ছে। সে কি আনন্দ! সে কি উৎসব! সমস্ত মায়ের প্রাণের ব্যাথা দিয়ে এই পূজা-গড়া। সারা বছরের যত দুঃখের কথা মেয়ে মায়ের আঁচলে নিজকে লুকিয়ে অতি ছোট সুরে বল্‌ছেন। মা শুন্‌ছেন, আর আঁচলে মুখ মুছ্‌ছেন। এ পূজা বাইরের জিনিষ নয়। সারা বছরের কষ্টের বোঝা কন্তা মায়ের চরণ-ছায়ায় নামিয়ে রেখে একটু সোয়াস্তি বোধ কচ্ছেন। শুধু তিনটি দিনের মিলন! এই তিনটা দিন তো দেখ্‌তে দেখ্‌তে ফুরিয়ে যাবে!

এই জন্যইতো এ পূজা এত দুর্লভ! যত দুঃখ সব ঘুচে গিয়ে মা ও মেয়ে আবার একত্র হোয়েছেন— এই মিলন যেন কত তপস্যার ফল! তাই দুর্গা-পূজা আমাদের দেশের মায়ের প্রাণের উৎসব। এই পূজার সংবাদ দিচ্ছে আগমনী গান, পূজা শেষ হওয়ার কান্নার স্বর বিজয়া গানে বেজে উঠ্‌ছে।

সেই পুরাণো আমলে বরের বয়স প্রায়ই বেশী হোত। ক'নেটি হোত ছোট্ট। এই জন্য ছড়া ও গানে আমরা শিবঠাকুরকে বুড় দেখ্‌তে পাই। বয়স বেশী হোক্‌, ছোট্ট বউটির জন্য তাঁর প্রাণে স্নেহের অভাব ছিল না।

ছোট বউএর প্রথম আলাপ

ছোট্ট মেয়ে বয়স্ক স্বামীর সঙ্গে যাচ্ছে। একটা ছড়ায় দেখতে পাই কেঁদে কেঁদে তার চোখ ফুলে উঠ্‌ল। সে স্বামীকে জিজ্ঞাসা কচ্ছে—"আমি

তোমার সঙ্গে যাচ্ছি, আমায় কে ভাত দেবে ?" স্বামী সস্নেহে বল্‌ছেন—"তোমার জন্য আমি একশ তু'শ চাষী দিয়ে ক্ষেত চষে রেখেছি, ভাতের অভাব হবে না" বউ আবার বল্‌ছে—"কাপড় কোথা পাব ?"—তোমার জন্য ঘরে ঘরে তাঁতিরা, নীলা-ম্বরী, ডুরে ও মেঘডুমুর শাড়ী তৈরী করছে।" কিন্তু এ কথাতো আসল কথা নয় ; প্রাণের কথাটি বল্‌তে যেয়ে ক'নে বউএর চোখে জল এল, ঠোঁট তুটি কাঁপ্‌তে লাগল। অতি কষ্টে সেই প্রাণের ব্যাথাটি চেপে রেখে সঙ্কোচের সঙ্গে বউ ব'লে ফেল্লে—"আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি, কিন্তু আমি কাকে মা ব'লে ডাক্‌বো ?" স্বামী সস্নেহে বল্‌ছেন—"আমার যে মা আছেন, তাকেই তুমি মা ব'লে ডাক্‌বে।" এই ছোট্ট মেয়েটির অজানা দেশে যাওয়ার ভয়, তার মনের তুঃখ ও ইচ্ছা এবং স্বামীর স্নেহ পুরাণো ছড়ায় কেমন একটা কান্নার সুরে মনকে আঘাত কচ্ছে।

একালের কথা

এতো গেল সেকালের কথা। এখন তো আর তুমি তত ছোট নও। এখন মাঝি ভাইকে ব'লে ক'য়ে ধীরে ধীরে নৌকা বেয়ে তো আর মায়ের কান্না শুন্‌তে চাইবে না। কিন্তু তবু তোমার মায়ের জন্য প্রাণ কাঁদ্‌বে, তোমার ছোট ভাইবোনকে স্মরণ কোরে চোখের জল পড়বে। যেখানে যাবে, সেখানকার তাঁরা একশবার ঘোমটা খুলে তোমার মুখখানি দেখ্‌বেন ও দেখাবেন। সে অবস্থাটি যে খুব সুখের কি না, তা বল্‌তে পারি না। যদি সকলেই তোমাকে নিয়ে আলোচনা করেন,—তোমার নাকের ডগা হোতে সুরু করে পায়ের নখ পর্য্যন্ত যখন সকলের দেখ্‌বার জিনিষ হোয়ে দাঁড়াবে—কেউ চস্‌মা আঁটা চোখে ভাল কোরে নিরীক্ষণ কোরে দেখ্‌বেন—কেউবা ঘোম্‌টা আস্তে তুলে স্থির হোয়ে চেয়ে দেখ্‌বেন, কেউ তোমার বর্ণের কথা বলে মন্তব্য প্রকাশ কর্‌বেন, কেউ তোমার

আঙ্গুলগুলি মোটা কি সরু, তোমার ঠোঁট্ পুরু কি পাত্‌লা, তোমার চুল ঘন কি অল্প, তোমার পা'দুখানি খড়মের মত কি পদ্মের মত, হাতের তেলো শক্ত কি কোমল,—তুমি হাঁট্‌তে যেয়ে কোন্ দিকে হেলে পড়, ডা'ন পা আগে ফেল কি বাম পা', বর্ণটি চাঁপা ফুলের মত কি কাল কেশরের মত, না মেঘের মত, ফ্যাকাশে না উজ্জ্বল,—এই রকমের তর্ক বিতর্ক করবেন, এবং সেই সঙ্গে আর আর বউদের সহিত তুলনা চল্‌তে থাক্‌বে,—তখন তুমি হয়ত থরহর কাঁপতে থাক্‌বে ও ঘন ঘন ঢোক্ গিল্‌বে—তা' আমি এখানে বোসে বেশ কল্পনা করতে পাচ্ছি।

সন্ত্রে থাকা

তুমি এখানে আছ ঠিক স্বচ্ছন্দভাবে, কে তোমার খোঁজ করে? কিন্তু বাজার হোতে কোন

জিনিষ কিনে আন্‌লে যেরূপ সকলেই একবার নেড়ে চেড়ে দেখ্‌তে থাকেন এবং কি রকমের জিনিষ, তাহার দাম কি হোতে পারে এই সম্বন্ধে সকলেই বিচার কোর্ত্তে থাকেন, তোমাকে নিয়ে সেইরূপ হোতে পারে—হবেই যে তা' 'বল্‌তে পারি না, কারণ এমন সকল বাড়ী আছে, যাতে এরূপ করা তাঁরা রুচি-সঙ্গত মনে করেন না। কিন্তু অনেক জায়গায়ই এরূপ দরদস্তুর ও যাচাই হোয়ে থাকে। কেনা জিনিষের সঙ্গে এইটুকু তফাৎ যে সে সকল জিনিষ, তাদের সম্বন্ধে যা কথাবার্ত্তা হয়, তাহা কিছুই বুঝ্‌তে পারে না; কিন্তু তুমি তো একখানি ঢাকাই শাড়ি কি কাণের মাক্‌ড়ি নও; তোমার সম্বন্ধে যে সকল কথাবার্ত্তা হবে, তা তুমি সবই বুঝ্‌বে; কিন্তু তোমাকে ঠিক মাক্‌ড়িটা বা শাড়ি খানার মত চুপ কোরে থাক্‌তে হবে। কোন বুড়ী এসে নাকটা শিকেয় তুলে হয়ত বল্‌বেন—"এই বউএর রং? এ যে কালো—তার সঙ্গে তো মোটেই মানাবে না।" তখন তোমাকে দেখাতে হবে যেন তোমাকে কিছু

বলা হয় নাই। তোমার সম্বন্ধে যে আলোচনাই হউক না কেন,—তুমি ঠিক সিদ্ধ পুরুষের মত হয়ে থাক্‌বে। দুঃখে বিরক্তির ভাব দেখাতে পার্‌বে না। দাঁত বার কোরে হাস্‌তে পারবে না—মাটীর দিকে চেয়ে থাক্‌তে হবে; তুমি নিজে ছুটে যেতে পার্‌লেও যিনি তোমায় ধোরে নে যাবেন, তার সঙ্গে তালে তালে পা ফেলে মল বাজিয়ে অতি ধীরে হেঁটে যেতে হবে। মুখে কথাটি নেই—লজ্জায় জড়সড়, যেন ছবি বা পুঁতুল, এমনটি হোয়ে থাক্‌তে পেলে তবে লক্ষ্মী-বউ নামটি পাবে।

তোমার বাড়ী

কিন্তু তোমার যতই কেন দুঃখ কষ্ট না হউক, এটা তোমার নিশ্চয় বুঝ্‌তে হবে, যে ঘরে তুমি এলে, সেই নূতন অচেনা স্থানটি হবে তোমার বাড়ী। যে পুরাণো চেনা জায়গা ও তার সঙ্গে জড়িত শত শত

স্নেহ মায়া তুমি ছেড়ে এলে—সেটির জন্য তোমার মনের চিরকালই একটা মনের টান থাক্‌বে সত্য, কিন্তু সেটি তোমার আসল থাক্‌বার স্থান নয়।

এই জন্য কিসের মধ্যে পড়্‌লুম—ভেবে বেশী কান্না কাটি কোর না। আকাশে ডানা ঝাপ্‌টে উড়ে বেড়াতে, এখন পিঁজরার মধ্যে প'ড়ে দম বন্ধ হবার জো হোয়েছে—এরূপ ভেব না। যেটা তোমার প্রকৃত বাড়ী হোল—প্রথম থেকেই তা চিন্‌তে সুরু করে দাও। কেন না এখানেই তোমাকে থাক্‌তে হবে। বাডীর কার কিরূপ মেজাজ—এটা ভাল কোরে বুঝে নাও। কেউ এমন আছেন—ভয়ানক চটা মেজাজ—কথায় কথায় রাগ, কিন্তু হয়তঃ প্রাণটা কোমল ; যেমন ডাবের বাইরেটা শক্ত, কিন্তু ভিতরটা নরম—তাঁর প্রকৃতি তেমনই বাইরে খারাপ হোলে ভিতরে ভাল ; এটা তোমাকে ভাল কোরে বুঝ্‌তে হবে। এই সকল লোককে খুসী রাখা বেশী শক্ত নয়। তিনি রাগ কল্লে, তুমি সয়ে থেকো। কথার পিঠে কথা বোল না। কিম্বা মুখখানি রাঙ্গা করে বা

তার কোরে দেখিয়ো না যে তুমিও খুব চটে গেছ— কিন্তু কথা বলতে পাচ্ছ না, কেননা তুমি বউ। কিছু কাল বকে ঝকে তিনি ঠাণ্ডা হোয়ে যাবেন। তার পর যদি দেখেন, তুমি তার রাগটা ঠিক বুদ্ধিমানের মত সহ্য করে ফেলেছ, তা হোলে তিনি মনে মনে বড্ড খুসী হবেন। তার পর যদি তুমি তাঁর একটু সেবা শুশ্রূষা কর, তা হোলে তিনি তোমার খুব পক্ষপাতী হোয়ে পড়বেন। ঝড়ের সময় যেমন ডিঙ্গিখানির একটু সাম্‌লে থাকা দরকার, তাঁর রাগের সময়ও তোমার তেমনই একটু সাম্‌লে থাকতে হবে, এই পর্য্যন্ত। কোন কোন বউ এইরূপ গুরুজনের রাগের সময়ে হয়ত কোন কথার উত্তর করে না, কিন্তু মুখ চোখ দিয়ে দেখাতে ছাড়ে না যে, সেও বেজায় চটে গেছে এবং তাঁর কাছে আর সহজে ঘেঁষ্‌তে চায় না, ফলে এই দাঁড়ায় যে তাঁর রাগও ক্রমশঃ বেড়ে যেতে থাকে। বাইরের লোক এসে হয়ত তোমার কাছে "আহা" "উহু" কর্‌বে। সেই গুরু ব্যক্তির কথা তুলে বল্‌বে—"তাঁর এ ভারি অন্যায়, এমন সকল

কথাও নাকি মানুষে নতুন বউকে বল্‌তে পারে ?" এই সকল বাইরের দয়া হোতে তুমি নিজকে সাবধান রেখো ; কারণ সে সকল কথা শুন্‌লে তোমার রাগ ও মনের বিরক্তি বৃদ্ধি পাবে মাত্র। যারা রাগ উস্কিয়ে দেয়—তারা মিত্র নয়। গৃহের শান্তি বজায় রাখ্‌তে হবে—এটি তোমার প্রথম ও প্রধান চেষ্টা হওয়া উচিত। গুরুজনের ভর্ৎসনা শুনে অপরের কাণে সে কথা তুল না, কিংবা অপরে যদি দয়া দেখাতে আসে, তাকে প্রশ্রয় দিও না। কারণ সেই গুরুজন তোমার আপনার, বাইরের লোক-দেখান স্নেহে তোমার মনের ক্ষুধা মিট্‌বে না। বাড়ীতে কোন গোলমাল হোলে সেই গোলযোগের মূলটা কোথায়, 'তা' ভেবে দে'খ, এবং তুমি সয়ে থাক্‌লে, কিংবা বিনয় কল্লে, মাটীর মতন হোতে পার্‌লে সেই গোল মিট্‌তে পারে কিনা—তা' চিন্তা কোরে দে'খ। এ জন্য তোমার জেদ ও অভিমান সব ছেড়ে দিও ; সমস্ত ঝড় মাথায় কোরে নিয়ে, নিজের মান অপমান ও রাগ ছেড়ে দিয়ে যদি তুমি,

ভগবানের পায়ে ফুলটির মত হোয়ে পড়্‌তে পার তবেই তুমি লক্ষ্মীবউ হোতে পার্‌বে।

হয়ত নূতন বাড়ীতে এমন দুই একটি লোক পাবে, যাঁরা মুখে বড় রাগ দেখান না ; কিন্তু কোন অন্যায় আচরণ দেখ্‌লে মনে মনে চটে থাকেন ; তাঁরা তত ক্ষমাশীল নন্। তাঁরা যেটা তোমার দোষ বলে মনে কর্‌বেন, সেটা সহজে ভুলবেন না। এ সকল লোক নিয়ে কারবার করাটা একটু শক্ত এবং এইরূপ প্রকৃতির লোকের কাজ কর্ম্ম কর্‌তে একটু বিশেষ সাবধানতার দরকার। যাতে নিজের কোন ত্রুটি না হয়, সে দিকে দৃষ্টি রাখ্‌তে হ'বে।

নিজের দোষ ও পরের দোষ

কিন্তু যিনি যেমন লোকই হউন না কেন, ভাল-বাসার যাদু মন্ত্র দিয়ে সকলকে ভুলিয়ে ফেলা যায়।

তুমি যদি সব্বাইকে আপনার জন বলে মনে কর, তবে তুমি কখনও কারো মন হোতে দূরে থাক্‌বে না। নিজের মান অপমান সরিয়ে রেখে, পরের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নিজকে সমর্পণ কোরে দেওয়া—এই হচ্ছে গৃহস্থালীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা। স্বামীগৃহ হোচ্চে এই শিক্ষার কলেজ। এখানে পরের দোষ দেখ্‌বে না, তা' নিয়ে আলোচনা করবে না ; নিজের কি দোষ আছে, তাই সর্ব্বদা চিন্তা করবে। পরের দোষের জন্য ভগবান তোমাকে দায়ী করবেন না। তাঁরা তোমায় কষ্ট দিতে পারেন সত্য, কিন্তু নিজে নিরপরাধ থাক্‌লে তোমায় মনের শান্তি হোতে কেউ বঞ্চিত করতে পারবে না। যে তোমার উপর অন্যায় কোরেছে, তাকে যদি অন্তঃকরণ দিয়ে ক্ষমা করতে পার, তবে দেখ্‌বে তোমার ইষ্ট হয়েছে—অপকারী তোমার কোন অনিষ্ট করতে পারে নাই। পরের দোষ দেখা অতি সহজ। যে লোক যত অশিক্ষিত ও বর্ব্বর, সে তত বেশী পরের দোষ দেখে ও আলোচনা করে। লোক যত সভ্য ও উন্নত হয়,

সে ততই নিজের দোষের আলোচনা করে। এই সত্যটি সর্ব্বদা মনে রেখো যে, এক জন যদি তোমার উপর হাজার অন্যায় করে, তার বিষয়ে তুমি যত চিন্তা কর্‌বে, ততই তোমার রাগ বৃদ্ধি পাবে মাত্র। রাগে মানুষের কল্যাণ হয় না,—কল্যাণ হয় প্রেমে। তোমার যদি অতি ছোট একটি দোষ থাকে, তা' আলোচনা ক'রে সংশোধন কর্‌তে চেষ্টা কর্‌লে তোমার উন্নতি হবে, কিন্তু পরের যদি পর্ব্বত প্রমাণ দোষ থাকে, তা' আলোচনা করে তোমার নিজের অবনতি বই উন্নতি হবে না।

এজন্য তুমি নিজের দিকে সর্ব্বদা একটা লক্ষ্য রেখ, এবং মনে কো'র তুমি একটি ফুলের কলি, পৃথিবীর হাওয়ায় ও আলোতে তুমি ফুট্‌বে ব'লে এসেছ। সে হাওয়া ও আলোর যিনি কর্ত্তা, তিনি তোমার ফোট্‌বার অপেক্ষা কচ্ছেন। সুতরাং পৃথিবীর ধূলো যাতে তোমার গায়ে না লাগে—সেই ভাবে তুমি তাঁরই যোগ্য হয়ে উঠ্‌তে চেষ্টা কোর। তার পূজায় লাগ্‌তে হবে। সেইটি হবে তোমার জীবনের

লক্ষ্য। তুমি গঙ্গাধারার মত হরিদ্বার হোতে এসেছ, তাঁরই পাদপদ্ম হোতে ছুটে এসেছ—তোমার সম্মুখে প্রেমের মহাসাগর বুক বিস্তার কোরে আছেন, তুমি সংসারের কানাচে আটকে গেলে সেখানে যেতে পারবে না।

পরের জন্য

আজ তোমার গায়ে হলুদ। আজ লাল চেলি প'রে মাথায় চন্দন মেখে, গায়ে অলঙ্কার প'রে, চুল বেণী করে' বেঁধে তুমি যাচ্ছ। পুরুৎ মন্ত্র পড়্‌ছেন, বাড়ীর দোরে নহবৎ উঠেছে। তুমি বাপ মায়ের দুশ্চিন্তার কারণ ছিলে; বাড়ী শুদ্ধ সকলে তোমায় বাড়ী ছেড়ে যাওয়ার জন্য এতকাল ব'সে ব'সে ভেবেছেন; আজ তুমি লক্ষ্মীমূর্ত্তিতে পায়ে আল্‌তা পরে চল্লে। তোমার মাথায় চারদিক্ হোতে ধান-দূর্ব্বা পড়্‌ছে, সেই আশীর্ব্বাদ মাথায় কোরে পরের

বাড়ীতে যাও। জন্মে জন্মে তুমি পরের জন্য হোয়ো এবং পরের জন্যই যেও। জে'ন, পরের জন্য যাঁর জীবন, তিনিই দেবতা। নিজকে ভুলে যেয়ে পরকে বরণ করাই হচ্ছে মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ।

তা' হোলে দুঃখ কোথায়? যে নিজের ক্ষুধা ভুলে যেয়ে পরের ক্ষুধা দেখ্‌লে উতলা হয়—সেই তো দেবতা। সে দেবতা কি দেখ নাই? সে দেবতা ঘরে ঘরে দেখেছ। সে দেবতা তোমার মা। যার নিজের গায়ে কাঁটার আচড় লাগলে সে দিকে তিনি ফিরেও তাকান না, কিন্তু পরের গায়ে লাগ্‌লে "আহা উহু" কোরে উঠেন সে দেবতা কি তুমি দেখ নাই? দেখেছ বইকি? সে দেবতা তোমার মা। তাঁকে প্রণাম ক'রে—নতুন জায়গায় যেও, পরের জন্য বেদনার সেই মহাশিক্ষা মাথায় পেতে মূলধনের মত নিয়ে যেও। নিজের সুখ খুঁজতে যেও না, তা যারা গেছে তারা সে সুখ পায় নি, সংসারটা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে এসেছে। দেবতার নৈবেদ্য হাতে পূজারিণীর মত, নিজকে সঁপে

দেওয়ার মন্ত্র নিয়ে নূতন গৃহে প্রবেশ কর। আমরা যাত্রাকালে তোমার সেই মূর্ত্তি দেখ্‌বো—সে দেবী-মূর্ত্তি মাটিতে গড়া পুতুল নহে; পরের দুঃখে সমবেদনাময়ী, পরের শুভ করিবার ইচ্ছার জীবন্ত মূর্ত্তি-স্বরূপা সেই দেবীমূর্ত্তি। এই গায় হলুদের দিনে এই ক'টি কথা তোমায় বল্‌তে এসেছি।

খুঁৎধরা

যাঁরা তোমায় নূতন জিনিষ মনে কোরে কেবলই তোমার সম্বন্ধে আলোচনা কচ্ছিলেন, তাঁরা শেষে থেমে যাবেন। পাড়ায় তোমার চুলের কথা নিয়ে, বর্ণের কথা নিয়ে যে বিচার চল্‌ছিল, সে বিচারের বৈঠক ভাঙ্‌বে। "কই গো তোমাদের বউকে দেখাও" বলে দিনের মধ্যে একশবার আর লোক আনাগোণা কর্‌বেন না। সব্বাই তোমায় চিনে ফেলেছেন। বাইরের রূপ দেখান হোয়েছে, এখন

তোমার ভিতরকার রূপ দেখাবার পালা। এখন তোমার বাইরের রূপ সম্বন্ধে যে দুই একটি মন্তব্য হবে, সে কেবল ভিতরকার রূপের সাক্ষী করবার জন্য। তোমার ব্যবহারে চ'টে গেলে, তুমি সুন্দর হোলে কেউ হয়ত বল্‌বেন "এটি একটি মাকাল ফল"। তোমার রং কালো হোলে হয়ত বল্‌বেন—"যেমন ভেতর তেমন বাইর।" এ ছাড়া কথায় কথায় তোমার মা বাপকে ধোরে হয়ত বা টানাটানি হবে। তোমার ব্যরহারে কোন খুঁৎ পেলে এমন সকল কথা হয়ত তারা কইবেন, যাতে তোমার মনে খুব বিঁধবে। যখন তোমার মায়ের কথা ও বাপের কথা ভাব্‌তে তোমার বুক ফেটে যাবে, তখনই হয়ত তাঁদের সম্বন্ধে অতি নিষ্ঠুর মন্তব্য তোমায় শুন্‌তে হবে। সেগুলি সয়ে থাকা খুব শক্ত, কিন্তু তোমাকে সয়ে থাক্‌তে হবে। তুমি কনে বউ, তোমার মুখে কথা বল্‌বার শক্তি সমাজ দেন নাই। সকল সময়ই যে নূতন বউকে এই সকল কষ্ট সইতে হয়, তা' বলছি না, কিন্তু অনেক

হিন্দু ঘরেই—বিশেষ পাড়াগাঁয়ে নূতন বউকে এই ভাবে লাঞ্ছনা পেতে হয়, আমি তাদেরেই মনে করে আমার কথা বলে যাচ্ছি।

এখন দেখা যাচ্ছে তুমি শারীরিক রূপ সম্বন্ধে অতিরিক্ত আলোচনা হোতে যে দিন মুক্তি পাবে, সেইদিন হোতেই হয়ত তোমার চরিত্রের আলোচনা সুরু হবে। সে ও তোমার সয়ে থাকতে হবে।

ক্ষমা

কিন্তু মানুষ যেরূপ বাহিরের একটা রূপ ল'য়ে সংসারে আসে, তার একটা ভিতরকার রূপ ও জন্মকাল হোতেই দেখা যায়। কেউ যদি কানা বা খোঁড়া হয়, তাকে দেখে তোমার রাগ হয় না দুঃখ হয়? নিশ্চয়ই দুঃখ হয়। কেউ যদি রাগী, হিংসুক বা অত্যাচারী হয়, তবে সেটিও জে'ন তার

স্বভাব। তার রূপ-গত দোষগুলি দেখে যদি তোমার দুঃখ বা করুণা হয়, তার চরিত্রগত দোষ দেখলে তোমার বিরক্ত হওয়ার কারণ কি? তাকে দয়া বা করুণা কর্‌তে শেখ। এই জন্য যে রেগেছে তার দেখাদেখি তুমি রেগ না, কানাকে দেখে নিজের চোখ কানা কে কোরে থাকে? যে হিংসুক সে তো নিজেই জ্বলে মরছে, তার কথা নিয়ে রেগে যাওয়ার কোন প্রয়োজন নাই। বরঞ্চ স্নেহদ্বারা এবং করুণা দ্বারা তাদের স্বভাবের ত্রুটি শোধ্‌রাতে চেষ্টা কর। সেই চেষ্টায় যদি একটি লোকের ও চরিত্র সংশোধন করতে পার, তবে জীবনে একটা মহৎকাজ কর্‌তে পার্‌লে এরূপ মনে হবে। আর যদি ক্ষমাদ্বারা ক্রোধকে জয় কর্‌তে না পার, ত্যাগদ্বারা ভোগকে জয় না কর্‌তে পার, অন্ধকে বহু চেষ্টার ও চক্ষু দিতে না পার, তবে একফোটা চোখের জল ফেলে জোড় হাতে ভগবানের নিকট তাদের হোয়ে প্রার্থনা ক'রো। জানিও তুমি যা পার্‌বে না, ভগবান তোমার নিকট তা' চাবেন না। তুমি চেষ্টা কর্‌তে পার,

সেইটুকু তিনি তোমার কাছে চাইবেন, ফলাফল তাঁরই হাতে।

আদর ও অনাদর

নূতন বাড়ীতে যদি বেশী আদর পাও, তবে সেই আদরে অন্ধ হোয়ে নিজের কর্ত্তব্য ভুল না। দুঃখ অনেককে একবারে দামিয়ে ফেলে—তাকে পাপ-পথে নিয়ে যায়। দুঃখে প'ড়ে কত লোক চুরি করে, মদ খেতে সুরু করে, এমন কি গলায় ফাঁসি দিয়ে মরে। আবার সেই দুঃখই কত লোককে উন্নতির পথে নিয়ে যায়। যে হয়ত কুড়ে হয়ে ঘরে ব'সে থাক্‌ত, দুঃখে পড়ে সে কষ্টসহিষ্ণু হয়, পরিশ্রমী হয়, সংসারে কাজ কর্ত্তে শেখে। এমন কি যে নিজে দুঃখ পেয়েছে, সে পরের দুঃখ বোঝে, তাকে দয়া কর্‌তে শেখে, এবং সে ভগবানের উপর নির্ভর কোরে তাঁকে ভক্তি কর্‌তে পারে।

দুঃখ পেলে যেরূপ কোন কোন মানুষ মাটী হোয়ে যায়, সেরূপ বেশী আদরে কত লোক একবারে নষ্ট হয়। সে অন্যায় কর্‌লে ও তাকে কেউ কিছু বলে না, সুতরাং সে ভাবে সে যা ইচ্ছা তা' কর্‌তে পারে। সে সংসারটাকে তার বড় একটা খেলার পুতুল ভেবে ভেঙ্গে গ'ড়ে তার খেয়ালের মতন কোরে সেটাকে চালাতে চায়। তার যা ইচ্ছা তাই যদি না হয়, তবে রেগে গিয়ে সে একেবারে জ্ঞানশূন্য হোয়ে পড়ে। অপরের হাজার কষ্ট হোক না কেন, সে যেটি ধ'রে বসেছে, তা করতেই হবে, তা' না কল্লে রক্ষে নেই। এ সম্বন্ধে একটা গল্প বল্‌ছি শোন।

আবদারে রাণীর গল্প

এক রাজার একটি "আবদারে রাণী ছিল। রাজা আদর দিয়ে তার মাথাটি খেয়েছিলেন। সেই

রাজা পশুপাখীর কথা বুঝ্‌তে পার্‌তেন, কিন্তু তার উপর দেবতাদের একটা হুকুম ছিল যে তিনি পশু-পাখীর কথা যা শুনবেন ও বুঝ্‌বেন, তা আর কাউকে বল্‌তে পারবেন না; যে দিন বল্‌বেন, সেই দিনেই তাঁকে মর্‌তে হবে।

একদিন রাজা রাণীর সঙ্গে ব'সে ছিলেন, এমন সময় তাঁর সোণার খাঁচা হোতে দুটো টিয়েপাখী কথা কইচে শুন্‌তে পেয়ে তিনি সেইদিকে কান পেতে রইলেন। টিয়ের স্ত্রীটা তাকে বল্‌চে, "তুমি দাঁড়টার ওদিক পানে অত ঘেঁসে যেও না, বলচি, তোমার পায়ে পড়ি। ঐ কালো বেড়ালটা ব'সে ব'সে তোমার দিকে তাকিয়ে থাকে ও আমার মোটেই ভাল লাগে না। তারপর যখন তুমি দাঁড় ঘেঁসে খাঁচার জালগুলির এক কোণে যাও, তখনই দেখ্‌তে পাই, বেড়ালটার দুটো চোখ ঠিক দুই টুকুরা কাচের মত জ্বল্‌তে থাকে। এবং তুমি যখন চোখ বুজে খাঁচার শলা-গুলির দিকে চেয়ে একটু- বসেছ, অমনই বেড়ালটা সেই দুটো চোখ আগুনের ফিন্‌কির মতন কোরে

লেজটা ফুলায়ে আস্‌তে থাকে। তোমায় দুদিন থাবা মেরেছিল আর কি ? আমি চেঁচামিচি ক'রে জাগিয়ে দিলুম তাই রক্ষে"। টিয়েটা বল্লে, "রেখে দে, পিঁজরার মধ্যে থাবা গলাবে কিরূপে ?"

"থাবার কতকটা ঢুকিয়ে পাখের উপর তো আঁচর মার্‌তে পারে। খানিকটা মাংস তুলে নিয়ে তো একটু রক্তারক্তি কর্‌তে পারে। আমার বড্ড ভয় হয়।"

"যা তোর এ সকল মেয়েলী ভয় আমার নেই। আমি যদি ছাড় পেতুম তবে বেড়ালটাকে দেখিয়ে দিতুম।"

'কি কর্‌তে ?"

"আচ্ছা করে ঠুক্‌রে দিতুম। দেখ্‌বি কেমন কর্ত্তুম।"

এই বোলে টিয়েটা গলাটা ফুলিয়ে বীরের মতন সেই দাঁড়টার উপর দাঁড়ালো ! যেমন করে গোরা সৈন্যগুলি কলার গলায় এঁটে বুকটা উঁচু কোরে দৃক্‌পাত না কোরে দাঁড়ায়, টিয়েটা সেইরূপ গলা ও

বুকের পাটাটা ফুলিয়ে ঘাড়টা উঁচু কোরে বীরত্ব দেখাতে লাগলো। এই দেখে রাজা একটু হাস্‌লেন।

রাণীর প্রশ্ন

রাণী জিজ্ঞাসা কল্লেন "তুমি হাস্‌ছ কেন?" রাজা বল্লেন "সে আমি বলতে পারি না।" রাণী বল্লেন "তোমায় বল্‌তেই হবে।" তখন রাণীর চোখ দুটি দিয়ে জল পড়তে লাগ্‌লো। তা' দেখে রাজা একবারে গলে গেলেন এবং হাত দিয়ে চোখ মুছিয়ে রাণীকে কত আদর কর্‌তে লাগ্‌লেন। কিন্তু শুবি ভোলবার নয়। "কেন হেসেছিলে বল্‌তেই হবে।" তখন রাজা ব্যাপারটা সব খুলে বল্লেন—তিনি পশুপাখীর কথা বোঝেন, কিন্তু যা শুনেছেন তা' বল্লে তখনই তাঁর প্রাণ যাবে। রাণী কেঁদে কেঁদে বল্লেন "হাঁ এই কথা বল্লে আবার প্রাণ যায়? যদি যায়ই— তুমি তো কতবার বোলেছ, তুমি আমার প্রাণের চাইতে বেশী ভালবাস—এইবার বুঝ্‌লুম তোমার মতন মিথ্যাবাদী জগতে নেই।" রাজা কত বুঝালেন,

রাণী কিছুতেই বুঝলেন না। কেবল কাঁদছেন আর বল্‌ছেন—"থাক তোমার প্রাণ নিয়ে, আমি মরতে বস্‌লুম, আমার এ জীবনে কাজ কি? আমায় তো কেউ ভালবাস্‌বার নেই। আজ হোতে কিছু খাব না। না খেয়ে, এই প্রাণ দেবো কি দেবো।" তুমি শুন্‌লে আশ্চর্য্য হবে, রাজামশায় উইল টুইল কোরে মর্‌তে প্রস্তুত হোলেন। রাণী যখন কিছুতেই ছাড়্‌বেন না, তখন আর উপায় কি? রাণীকে সে কথা শুনিয়ে মর্‌তে সঙ্কল্প কল্লেন।

এখন বুঝ্‌লে আদর দিলে কোন কোন সময় লোক কতটা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হোতে পারে। তখন মনে হয় এসকল লোককে আদর না দিয়ে ঠেঙ্গালে ভাল হোত। এ সম্বন্ধে আর একটা গল্প বলি শোন।

বেড়াল কাটার গল্প

এক রাজপুত্র ও তার বন্ধু কোটালের পুত্র দুই জনে দেশ ভ্রমণে বার হোয়েছেন। তাঁরা পরম রূপবান্। আর এক দেশের রাজার দুইটি মেয়ে ছিল। রাজপুত্র ও কোটালের পুত্র সেই দেশে গেলে রাজা তাদের পরিচয় পেয়ে তাঁর দুইটি মেয়ের সঙ্গে তাদের বিয়ে দিলেন।

তাদের জন্য দুইখানি সুন্দর বাড়ী তৈরি হোল, এবং রাজপুত্র সস্ত্রীক তার একখানিতে গিয়ে বাস করতে লাগ্‌লেন। কিন্তু রাজকন্যা বড় আবদারে—সে রাজপুত্রকে ঠিক তার একটি কর্ম্মচারীর মত ব্যবহার কর্‌তে লাগ্‌লো। রাজপুত্রকে সেই বাড়ীর সীমানা পার হোতে দেওয়া হোত না। যা' বল্‌বে রাজকন্যা, তাঁকে বিরুক্তি না কোরে তখনই কর্‌তে হোত। এই ভাবে তিন চার মাস চলে গেল। যে পাখী আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছিল, তাকে খাঁচার মধ্যে আট্‌কালে সে যেম্‌নি শুকিয়ে যায় এবং ধড়্‌ফড়্‌

করতে থাকে, আমাদের রাজপুত্রের হোল সেই অবস্থা।

কোটালের কথা

অনেক অনুনয় বিনয় কোরে রাজপুত্র একদিন দুই ঘণ্টার জন্য বাইরে বেড়াতে অনুমতি পেলেন। বহুদিন পরে একটু বাইরে এসে যেন তিনি হাঁপ ছেড়ে বাঁচ্লেন। এমন সময় দেখ্তে পেলেন, কোটালের-পুত্র সেইখানে একটা ঘোড়ায় চ'ড়ে বেড়াচ্ছেন। তাঁর চেহারায় দিব্য কান্তি ফুটে পড়্ছে, গাল দুটি আরও ভরে এসেছে ও লাল হয়েছে—ইয়া দুই গোঁপের বাহার। তিনি রাজপুত্রকে দেখে প্রথম চিন্তেই পারেন নি। কোথায় গেছে সেই হৃষ্টপুষ্ট সুন্দর চেহারা। সারেঙ্গের খোলের মত শুকিয়ে, নুয়ে পড়েছেন। তাঁকে ভাল কোরে নজর করে শেষে চিন্তে পেরে আশ্চর্য্য হোয়ে কোটাল-পুত্র বলে উঠ্লেন—"ভাই, তোমার এই হাঁড়ির হাল কেন হোল?" রাজপুত্র তাঁকে নিজের

দুঃখের কথা খুলে বল্লেন,—তিনি ঘর হোতে বার হোতে পান না। এ ঘর থেকে ও ঘরে গেলে রাজকন্যা বলেন—"কার হুকুমে এলে ?" ভাবনায় রাতে ঘুম হয় না,—একবারে ক্ষুধা হয় না। "জানতো ভাই, দু দশ ক্রোশ ঘোড়ার পিঠে ঘুরে না এলে সে দিনটাই শরীরটা খারাপ হোয়ে থাক্‌তো—তা' ভাই এমন বাঁধুনীর মধ্যে প'ড়ে খাবার রুচি ও চোখের ঘুম দুইই চলে গেছে।"

কোটালের পুত্র গোঁপে চাড়া দিয়ে হো হো ক'রে খানিকটা খুব হেসে নিলে। রাজপুত্র বিস্ময়ে তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন, তারপর বল্লেন—"তুমিও তো ভাই এক রাজকন্যা বিয়ে কোরেছ, তোমার এরূপ স্ফূর্ত্তি কি ক'রে হোল ?"

"সে ভাই অনেক কথা! বল্‌ছি শোন। আমি একেতো কোটালের ছেলে, তারপর বিয়ে কল্লুম রাজকন্যা, এরা হয়তো আমায় গ্রাহ্যির মধ্যেই নেবে না। তাই বিয়ের পর প্রথম দিন যখন গিয়ে খেতে বস্‌লুম, তখন আমার স্ত্রী ও বাড়ীর

অন্যান্য মেয়েরা সেইখানে ছিল ;—দেখলুম একটা বড বেডাল ধীরে ধীরে আমার থালার দিকে এগুচ্ছে। তখন কিছু না বোলে কোমর থেকে তলোয়ার খানি বার কোরে একটি কোপ ঝেড়ে দিলুম, বিডালটা দুই টুক্‌রা হোয়ে গেল। তারা আমায় অন্য একটা জায়গায় নিয়ে সোণারূপার থালায় কোরে আবার ভাত ব্যেন্নুন দিলে ; কিন্তু সেই যে তারা ভয় পেল, তদবধি আমায় দেখে তারা ভয়ে জড়সড় হয়ে থাকে, যা বলি তাই করে।"

রাজপুত্তুরের নকল করা

রাজপুত্তুর ভাব্‌লেন, বেশ একটা শিক্ষা হোল, তাঁর কোমরে তরোয়াল ঝুলোনই থাক্‌তো। তিনি সেদিন বাড়ী ফিরে যখন খেতে বসেছেন ও পাতের কাছে একটা বেড়াল এসেছে, অমনই ঝাঁ কোরে বেড়ালটাকে এক কোপে কেটে ফেল্লেন। কিন্তু তিনি দেখে আশ্চর্য্য হোয়ে গেলেন যে, রাজকন্যা ও তাঁর সখীদের তাতে ভয় পাওয়া

দূরে থাকুক্, তারা একত্র হোয়ে খিল খিল কোরে হাস্‌ছে। রাজপুত্তুর তো অবাক্, রাজকন্যা বল্লেন—"বেড়াল মারতে হোলে প্রথম রাতে—শেষে মার্‌লে কিছু হয় না।"

সুতরাং যাকে গোড়ায় আদর দেখিয়ে আবদারে ক'রে তোলা গেছে—শেষে চোখ রাঙ্গালে তার আর সংশোধন হয় না।

কিন্তু একথা সকলের পক্ষে খাটে না। কোন কোন বউ এমন আছে যে আদরে তাদের প্রকৃতি বড় মধুর হয়। ঊষার কিরণ এবং হাওয়া পেলে যেমন ফুলটি ধীরে ধীরে ফুটে ওঠে ও বাগান আলো করে, আদর পেয়ে সেই সকল কনেবউএর স্বভাবটি তেমনি যেন সোণার মতন সুন্দর হয়ে ওঠে। নিজে আদর পায় বোলে সে পরকে অনাদর করে না; বরঞ্চ তার দিকে সকলের যত্ন দেখে, সে যেন নিজে একটু সংকোচ বোধ করে। গুরুজন তাকে দিয়ে হয়ত কোন কাজ করিয়ে

নিতে চান্ না, তাই বোলে সে বোসে থাকে না; তার কাজের উৎসাহ যেন আরও বেড়ে যায়। সে কাছে থাক্‌তে যদি গুরুজন নিজ হাতে কিছু কর্‌তে যান, সে তখ্‌খনিই জোর করে তাঁর হাত থেকে সে কাজটি নিয়ে নিজে করে। এ যেন সোণায় সোহাগায় মিলন হয়।

দেওয়া নেওয়ার হিসাব

তুমি এখন বুঝ্‌লে, কেউ যদি তোমার উপর অবিচার করেন, তবে তোমার মাথা ঠিক্ রাখতে হবে। কেউ অন্যায় কল্লে প্রতিহিংসা দিয়ে তার শোধ দিও না। পরের কাছে সেই কথা ব'লে ব'লে রাগ বা ক্ষোভ প্রকাশ কোরো না। যে দুষ্ট তার কাছে আছ ব'লে দুষ্টুমি শিখ না। যে ব্যক্তি যা' তা' বলে, তার কাছ থেকে যা' তা' বল্‌তে শিখ না। যে কথায় কথায় রেগে ওঠে,

তার দেখা দেখি কথায় কথায় রেগে উঠ না, কথায় কথায় তাকে ক্ষমা কোরো, বুঝলে। এটা জে'ন, তুমি যদি তোমার সকল দুঃখ স'য়ে সাঝ-সকালে ভগবানের নিকট এক ফোটা চোখের-জল নিয়ে উপস্থিত হোতে পার, তিনি তা' হোলে যে উপায়ে হোক তোমার সেই চোখের জল মুছোবেন। হয়ত তুমি যে ভাবে ইচ্ছা কচ্ছ, সে ভাবে তিনি তোমার দুঃখ মোচন কল্লেন না, কিন্তু অন্যভাবে করবেন কি করবেনই। এটা ঠিক জে'ন, তুমি একা নও, তোমার পেছন পেছন তিনি আছেন। তিনি আমাদের মাতা, তিনি আমাদের পিতা। আমরা যখন নিজের হাতে বিচারের ভার লই, নিজের হাতে কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করি, তখন তিনি আড়াল থেকে দেখেন। কত দুঃখ, কত লাঞ্ছনা যে তখন পাই, তা' তিনি দেখে দুঃখিত হয়ে থাকেন। মা-বাপের কথা না শুনে যখন ছেলে বনে জঙ্গলে ঘুরে শেষে পায় কাঁটা বিঁধলে কাঁদতে থাকে, তখন তাঁরা দুঃখ করা ছাড়া কি করতে পারেন? আমাদের ব্যাথা তাঁর

প্রাণে বাজে, কারণ আমরা তো তাঁর সন্তান। কিন্তু যাই নিজের বল ফুরিয়ে যায়, "তুমি এসে আমায় ধ'রে তোল, আমি সইতে পাচ্ছি না" বলে তাঁর শরণ নিই, তখন কি আর তিনি স্থির থাক্‌তে পারেন? উতলা হয়ে মায়ের মতন আমাদের কোলে তুলে আঁচল দিয়ে জড়িয়ে নিতে আসেন। একবার নিঃসহায় হোয়ে কেঁদে তাঁকে ডেকে দেখ,—তখন বুঝ্‌বে তিনি কেমন করে এসে তোমার দুঃখ-মোচন করেন। তিনি সর্ব্বব্যাপী—সবারই মধ্যে আছেন, কি ক'রে তা' টের পাওয়া যায়, তা' দেখাচ্ছি।

এই যদি একটি ছোট্ট ছেলে পথ হারিয়ে কাঁদ্‌তে থাকে, তবে সকলে গিয়ে তাকে আদর কোরে কত কি জিজ্ঞাসা করে,—সব্বাই তাকে আশ্রয় দিতে ব্যাকুল হয়, তার কান্না দেখ্‌লে সব্বারই প্রাণ কেঁদে ওঠে। এ দিয়ে কি বুঝ্‌তে পার না যে মাতৃভাবটি যদিও আকার ধোরে মা হোয়ে তোমার সামনে একবার মাত্র ধরা দিয়েছিল

সত্য, কিন্তু তা' ঠিক সেই জায়গায়ই আবদ্ধ হোয়ে রয় নি, সমস্ত বিশ্ব জুড়ে মাতৃস্নেহ প'ড়ে আছে; তুমি যখন শিশুর মতন নির্ম্মল, সরল ও স্নেহাতুর হবে, তখন চারিদিক থেকে তার সাড়া পাবে। আর দে'খ তোমায় তিনি ভোলেন না। বিশ্বজুরে কতকগুলি নিয়ম খাড়া ক'রে দিয়ে তিনি নিজকে তোমার কাছ থেকে দূরে রাখেন নাই। এই দে'খ না মায়ের স্তন্য—এটি তোমারই জন্য হোয়েছিল—আর কারু জন্য নয়। তুমি না খেলে সে স্তন্য বৃথা হোয়ে যাবে। এ জিনিষটা সমস্ত জগতের জন্য, কিংবা যার তার জন্য তৈরি হয় নি। এটি ঠিক তোমারই জন্য হোয়েছে। তোমায় যেন তিনি দেখে তোমায় রক্ষা করবার জন্য এটির ব্যবস্থা কোরে রেখেছেন। যিনি তোমায় এমন কোরে দেখেন, তিনি কি তোমায় ভুলতে পারেন? তুমি তাঁকে ভু'ল না।

এখন এ সকল কথা শুনে বল দেখি তুমি আদর পেসে আব্দারে হবে—না লক্ষীটি হবে?

তোমায় যাঁরা যত্ন করবেন, তাঁদের কি তুমি যত্ন করবে না হেলা করবে? তুমি নিজে দুঃখ পেলে যে তোমায় দুঃখ দিয়েছে, তাকে দুঃখ দিতে যাবে—না ক্ষমা কোরে কেঁদে এসে ভগবানের শরণ নেবে? রাগের কথা মুখে এলে সেটাকে সামলে নিয়ে মধুর কথা বলতে চেষ্টা করবে না চোখ রাঙ্গাবে ও হাত পা' ছুড়বে? আজ গায়ে হলুদের দিনে বলে যাও কি করবে—শ্বশুর বাড়ীটা একটা তীর্থের মতন ভেবে পুণ্য অর্জ্জন করতে যাবে—না সেটাকে তুমি তোমার একটা খেয়ালের জায়গা মনে ক'রে নিজের সুখ মনের মধ্যে প্রবল কোরে তুলে অপর সকলের সুখ ছোট ক'রে দেখবে।

সকলের আশা

দে'খ, সব্বাই তোমার মুখের দিকে চেয়ে আছেন। তোমার শ্বশুর বাড়ীতে যে নহবৎ

বাজ্‌ছে, তাতে সে বাড়ীর সবাকার প্রাণ যেন তোমায় ডাক্‌ছে। শ্বশুর শাশুড়ী ভাব্‌ছেন, লক্ষ্মী-বউটি এলে আমাদের ঘর আলো হবে। আমাদের যখন হাতে বল পাব না, তখন ডান হাতের মত সে এসে আমাদের সাহায্য কর্‌বে। সুখে তার সঙ্গে উৎসব কো'র্‌ব, দুঃখে সে আমাদের চোখের জল মুছোবে। সে আল্‌তাপরা পায়ের দাগ মাটীতে ফেলে যখন হেঁটে যাবে, তখন আমাদের উঠোনে যেন লক্ষ্মীর পায়ের চিহ্ন পড়্‌বে। সেই নহবতের সঙ্গে তোমার শ্বশুর শাশুড়ীর মনোবীণার তার বেজে উঠ্‌বে। তাঁদের সেই বহু আশা ভঙ্গ কোরো না। সেখানে যেয়ে তাঁরা যাতে সুখী হ'তে পারেন—তাই কোরো।

তোমার ছোট ছোট নন্দাই ও দেওর—তোমার সঙ্গে খেলা কর্‌বে, আমোদ কর্‌বে—তোমার কাছে ব'সে মনের সুখ দুঃখের কথা কইবে—এজন্য অপেক্ষা কোরে আছে। সানাইয়ের সুরের সঙ্গে তাদের মনেও বড সুখের সুর বেজে

উঠ্‌ছে। এমন হোতে পারে যে তাদের মা-বাপের সব খানি স্নেহ ও আদর তুমি কেড়ে নেবে আশঙ্কা কোরে তাদের মনে একটু ঈর্ষা জেগেছে। কিন্তু তারা বড আশা কোরে আছে। তারা তোমার কাছে এসে ছোট ভাই বোনের মতন ব'সে থাক্‌বে। তোমার হাতের বালা ও চুড়ি টেনে দেখ্‌বে ;—কোনও সময় তোমার চুল মুখে এসে ঝুঁকে পোলে তা' সরিয়ে রাখ্‌বে এবং এক্‌একবার তোমার মুখের দিকে স্নেহের সঙ্গে তাকিয়ে থাক্‌বে। এমন সব স্নেহের জিনিষ,—তাদের তুমি মায়ের পেটের ভাই বোনের মতন এত দিন ধোরে কোলে কাঁখে কোরে পাওনি,—হঠাৎ এসে একদিনে পেয়েছ। তাদের আশা ভঙ্গ কো'র না। বড় হোয়ে মনে রেখো তারা একান্ত আপনার জন—তারা যদি দুষ্টুমি করে,—তবে মায়ের মতন তাদের বুঝিয়ে ভাল কর্‌বে—তাদের ছেড়ে দিও না।

বাড়ীর চাকরবাকরেরাও কত আশা কোরে

আছে। তারা ভাব্ছে, তাদের খাবার দাবার দেখ্বার জন্য মা ঘরে এলেন,—তাদের কথা মনে রেখো।

তুমি মনে কোরো না—তুমি একজনের জন্য যাচ্ছ। দশের ঘরে তুমি দশ জনের জন্য যাচ্ছ। তাদের প্রত্যেকে তোমার জন্য আশা কোরে অপেক্ষা কচ্ছে। তাদের প্রত্যেকের আশা সাধ্যানু-সারে পূরণ করতে চেষ্টা কোরো। স্বামীর গৃহ ও স্বামী—এই উভয়কে তফাৎ কোরে দে'খ না। ভালবাসার চোখে এ দুইই এক। যে বউ স্বামী ও স্বামীর স্বজন—উভয়ের মন রক্ষা করে চল্তে পারে—সেই তো প্রকৃত গৃহলক্ষ্মী।

কোন্ বেশ পর্বে

আজ ভাল কোরে সাজগোজ কর। আজ উমা কৈলাসে যাচ্ছেন। আজ ভাল কোরে

খোপা বেঁধে দাও। খেজুর ছড়ি, লোটন, ডায়মন কাটা, বেনে খোপা, প্রভৃতি যত রকমের খোপা আছে, তার কোনটিতে ভাল মানাবে, পরীক্ষা ক'রে দেখ। নীলাম্বরীতে কিংবা আসমানী রঙ্গের শাড়ীতে ভাল দেখাবে, তার পরখ্ কর। লালডুরে রেশমী শাড়ী, আনারসী ও গোলাপী রঙ্গের শাড়ীর কোনটি পছন্দ-সই হবে দেখে নাও। হয়ত তোমার বাবা বহু কষ্টে দামী দামী অলঙ্কার সংগ্রহ করেছেন,—তার ভাবনায় তিনি অনেক রাত ঘুমুতে পারেন নাই, সেক্রার দোকানে বাকী প'ড়ে আছে। বড় দুঃখের এই গয়নাগুলি, তুমি একবার পর। সেই গয়না পরা দেখ্লে তাঁর চোখ জুড়োবে—এত কষ্ট সার্থক হবে।

আজ রূপের বাহার দে'খ। কালোরূপে মেঘের মত এক রাশ চুল কেমন দেখাচ্ছে! এইরূপ দেখে বুঝি ঋষিরা মায়ের কালোরূপ কল্পনা করেছিলেন,—রামপ্রসাদ ধ্যান কর্ত্তেন, আর গান বাঁধতেন! এই রূপ এক হয় আস্মানী

রঙের সাড়ীতে সাজাও—কালোতে কালো মিশে অপরূপ হবে—মেঘকে যেম্‌নি নীলাকাশ ঘিরে রাখে, সাড়ীর ফিকে কালো আঁচলা তেম্‌নি ঘিরে থাক্‌বে! আস্‌মানী না হোলে কালোর উপর নীল শাড়ীও মন্দ মানাবে না, কিন্তু তার আঁচলা ও পাড়টি হওয়া চাই সোণালী, তা' হোলে রূপটি ঝলমল কর্‌বে। চুল একবারটি ছেড়ে দিয়ে দে'খ। যোগীর ধ্যানে পাওয়া মায়ের রূপ এমনটি কি নয়? তারপর চুল বেঁধে বেণী কোরো, বেণী বেঁধে খোপা কোরো।

তুমি যদি গৌরী হও, তবে সোণার ফুল-তোলা রক্তবর্ণ জমির বারাণসী শাড়ী প'র। সেমিজ কামিজ ও সেই রঙের হোক। ফিকে ফর্সা রং হোলে হয়ত গোলাপী শাড়ীতে মানাবে ভাল। গৌরী হ'লে তো তোমায় দেখে উমার কথাই মনে হবে; বিয়ের আসরে দুর্গোৎসবের মণ্ডপ হোয়ে দাঁড়াবে; অতসী ফুলের রঙে চোখ জুড়িয়ে যাবে। লালশাড়ীতে সোণার আঁচলে সেই গৌর বরণ

ঝলমল করতে থাক্‌বে। এই রূপের তপস্যাই তো বরের বাড়ীর সকলে ব'সে ব'সে কচ্ছেন। চাঁপা ফুলের সঙ্গে রং মিলে গেলে তো তুমি শ্বশুর বাড়ী গেলেই জয়পতাকা উড়াতে পারবে। তোমার জন্য তোমার বাবার বেশী ভাব্‌তে হবে না। রং দিয়েই তুমি "সুন্দর" খেতাব পাবে। তারপর ভিতরটা রাংতা না সোণা, তার পরীক্ষা হবে; কিন্তু সুরুতেই তোমার জয় জয় কার।

আমি বলতে পারি না তোমার কালোরূপেই সুন্দর দেখেছি না তোমার গৌরবরণ দেখে মুগ্ধ হোয়েছি, কিংবা তোমার শ্যামবর্ণ দেখে চোখ জুড়িয়েছে! কখনও কখনও মিশমিশে কালো রং ও একরাশ কালো চুলের মত এমন সুন্দর কিছু দেখি নি। কষ্টি পাথরের সাবেকী দেবীমূর্ত্তি দেখে কে সে কালো রূপের নিন্দা করবে? আকাশের নীলিমা—যখন কালো মেঘের বেণী খুলে দিয়ে হাওয়ার ভরে থম্‌কে থম্‌কে চলে, তখন কে সে রূপের নিন্দা করবে? আমাদের কৃষ্ণ

কালো। সে কালোর ব্যাখ্যা যে কত গানে আছে, তা কি তোমরা জান না?

শ্যামবর্ণে চোখ জুড়িয়ে যায়—সে যে প্রকৃতির নিজের রং। আকাশে, গাছ-পাতায় জলে স্থলে সব জায়গায় যে সবুজাভ শ্যামবর্ণের খেলা। এই শ্যামা প্রকৃতির গায়ে আকাশের রোদ সোণালী ওড়না হ'য়ে শোভা পাচ্ছে, এবং মাথায় সোণার মুকুট পরাচ্ছে,—লাল, সাদা কত রঙ্গের ফুল শ্যাম বর্ণের গলায় মালা পরাচ্ছে। এ রংকে কে নিন্দে কর্‌বে? এমন চোখ জুড়ানো রং,—এমন শ্রীরামচন্দ্রের গায়ের রং দেখে যে না ভুলে গেল তার আবার চোখ কোথায়?

গৌরবর্ণের কথা না বলাই ভাল, কারণ জ্ঞানে হো'ক অজ্ঞানে হো'ক এই রংএর পায়ে তো আম্‌রা মাথা বিকিয়েছি।

বরের রং ও তোমার রং যদি ভিন্ন হয়, কালো যমুনায় ও সাদা গাঙ্গে মিশ্‌বে ভাল—মেঘের কাছে বিদ্যুৎ, পদ্মের কাছে ভ্রমর, এ সকল মামুলী

উপমা তো আছেই,—তা' বেমানান হবে না। রাধা-কৃষ্ণের মত যুগল কোথায় পাব? যদি দুই জনেরই রং কালো হয়, তা' হোলেই বা মন্দ কি? কালো আকাশের গায় কালো মেঘের খোলা বেণী যখন লুটিয়ে পড়ে, তখন কেমন দেখায়? নীল পদ্মের পাশেও তো ভ্রমরটি বেশ দেখায়। যার চোখ আছে সে সেরূপের গৌরব বুঝ্বে। আর যদি দুই জনেরই রং ফর্সা হয়—তবে তো সে হর-গৌরী মিলন, তার আর কি তুলনা দিব? এখন তোমার এর কোন্‌টি হল জানতে চাই।

শ্বশুর শাশুড়ী

বেশভূষা কোরে তো তুমি চল্লে। হয়ত তোমার শ্বশুর দিনরাত খাট্‌ছেন—তাঁকে দেখবার লোক নেই।

গিন্নী ছেলে নিয়ে ব্যস্ত—তাঁকে দেখ্‌বার সময়

নেই। তিনি কাজ হোতে বাড়ী ফিরে এসে নিজেই পাখা খানি খুঁজ্‌ছেন। পায়ের একপাটি চটি পাওয়া গেছে, আর একপাটি পান নাই—তাই খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হোয়েছেন। হয়তঃ তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে—কাছে কেউ নেই, নিজেই গ্লাসটি নিয়ে জল ভর্‌তে গেলেন। সারাদিন খাটুনির পর একটু বস্‌বার জায়গা খুঁজ্‌ছেন—এখানে কাগজের স্তূপ, ওখানে কাপড় চোপড়, চেয়ারের উপর কালীর দোত বা বইএর গাদা—বিছানার চাদর খানি পাতা নেই—তাকিয়ার খোল বদলানো হয় নি। কাকে বল্‌বেন?—সবাই কাজে ব্যস্ত—ছেলেরা স্কুল কলেজে বা খেল্‌তে গেছে; গিন্নি এক হয় রান্না কোচ্ছেন, না হয় রান্নার তদ্বির কোচ্ছেন। তখন তিনি একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বহুদিন হোতে তোমার কথা ভাব্‌ছিলেন। তোমার জন্য, আজ নয়, বহুদিন হোতে তিনি অপেক্ষা কচ্ছিলেন,—একটু পাখার হাওয়া খাওয়ার জন্য, তৃষ্ণার সময় এক গ্লাস জল পাবার জন্য—

তাঁর কাগজপত্র গুলি গুছিয়ে রাখার জন্য। তুমি যেদিন—আল্‌তাপরা পায়ের মল-বাজিয়ে লাল চেলিখানি খস্‌ খস্‌ কর্‌তে কর্‌তে সম্মুখে এসে দাঁড়ালে, তিনি সেই দিন তোমায় বহুদিনকার তপস্যার ফল—দুর্ল্লভ সামগ্রী মনে কোরে একবারে নিজকে নিঃসহায় শিশুর মত তোমার হাতে ছেড়ে দিবেন ;—দেখ' যেন তাঁর সেবার ত্রুটি না হয়। তিনি সেই সেবা পেয়ে সন্তুষ্ট হোয়ে যে নিশ্বাসটি ফেল্‌বেন, তাতে তোমার সমস্ত ভাবী অকল্যাণ কেটে যাবে। তুমি তাঁর বহুদিনের প্রত্যাশা অপূর্ণ রেখো না।

শাশুড়ী হয়ত সংসারের অনেক জ্বালা যন্ত্রণা পেয়ে পুড়ে ঝুরে আছেন। বড মেয়ে গুলি বিয়ে দিয়ে ফেলেছেন, হাতের লক্ষ্য নাই,—তাঁর সুখ-দুঃখের কথা বল্‌বার লোক নাই। বহুদিন হোতে ভাবছেন, "বউ আমার খাওয়া দাওয়ার যত্ন করবে—আমাকে এসে দেখ্‌বে, আমার তো কেউ নেই।" চোখের জল ফেলে তিনি তপস্যা কচ্ছিলেন,

কবে তুমি আস্‌বে! তুমি কে তা তো তিনি জান্‌তেন না—কিন্তু তুমি যে হও সে হও—তাঁর তপস্যার ফল—আত্মীয় হোতেও আত্মীয়,—এটি তিনি ভেবে রেখেছেন। আজ মাথায় প্রথম সিন্দূর এঁকে—লাল চেলী পরে, তাঁর পায়ে যে প্রণামটি কর্‌বে সেই প্রণামে তাঁর প্রাণ জুড়িয়ে যাবে। এমন স্নেহ—তপস্যার ধন তুমি, তাঁকে সেবা হোতে, সান্ত্বনা দেওয়া হোতে বঞ্চিত কোরো না।

যদি শ্বশুর শাশুড়ীর সঙ্গে তোমার বাপের বাড়ীর ঝগ্‌ড়া বেধে যায়—সেটা বড়ই কষ্টের কথা; কিন্তু দেওয়া থোওয়া নিয়ে এরূপ ঝগড়া মাঝে মাঝে বেধে ওঠে। এতে তোমার কি অপরাধ? কিন্তু এই ঝগড়াটার সমস্ত কষ্টই তোমাকে ভোগ কর্‌তে হবে। তোমার মা বাপ তো আপনার জন, কিন্তু শ্বশুর শাশুড়ী এখনও ঠিক আপনার মতন হন নি। এজন্য মা বাপের চাইতে শ্বশুর শাশুড়ীর দিক্‌টা তোমায় বেশী

টান্‌তে হবে। তা' হোলে নূতন বাড়ীতে তোমার আদর বেড়ে যাবে, এবং তাঁরা তোমার উপর কোন জবরদস্তি (যেরূপ বাপের বাড়ীতে যেতে না দেওয়া প্রভৃতি) কর্‌তে সংকোচ বোধ কর্‌বেন। বাপ মা তোমার অপরাধ নেবেন না। কারণ তাঁরা তো সহজেই এ ক্ষেত্রে তোমার অবস্থা-সঙ্কট বুঝ্‌তে পার্‌বেন। সুতরাং যতটা পার, শ্বশুর বাড়ীর দিকে টেনে কাজ কোরো, কারণ এ বিষয়ে প্রথম প্রথম সে বাড়ীর সকলেরই একটা সন্দেহের ভাব থাক্‌বে—দেখি বউ কোন পক্ষ নেয়। যখন তাঁরা বুঝ্‌তে পার্‌বেন, তুমি বাপ মায়ের অপেক্ষাও তাদের দিকে টেনে কথা কইচ, তখন তাঁরা তোমায় একান্ত আপনার জন মনে কর্‌বেন। এই অবস্থায় কৌশল খাটাবার উপদেশ দিচ্ছি না। সরস প্রাণে কাজ কোরে যেও, মা বাপের জন্য স্নেহ ও বেদনা বুকে চেপে রেখে শ্বশুর শাশুড়ীর প্রতি ভালবাসা বেশী দেখিও—এটিও বেশ সহজ ও সরলভাবে হোতে পারে। কোন্ পক্ষ অন্যায়

কচ্ছেন—তার বিচার করতে যেও না। তোমার বয়স অল্প, তুমি সবে মাত্র শ্বশুর বাড়ী পা' দিয়েছ, এমন সময় তোমার বিচার কেউ মাথা পেতে নেবেন না। শেষে এমন একটা সময় আসবে—যখন তুমি বুদ্ধি-বলে শ্বশুর বাড়ীর সকলকে চালাতে পারবে, এবং শ্বশুর হয়ত দিনের মধ্যে দশবার নিজে এসে জিজ্ঞাসা করবেন—"এ বিষয়ে বউমা, কি বলেন?" কিন্তু এখন কতকদিনের জন্য নিজকে সংবরণ কোরে রাখাই ভাল।

ঘরের দেবতা

তুমি লক্ষ্মীটির মত সাজ গোজ কোরে শ্বশুর বাড়ী চল্লে—তোমার রূপ ধোরে স্বয়ং লক্ষ্মীই বাড়ীতে শুভাগমন কল্লেন—তার পরিচয় সুরু থেকেই দিতে চেষ্টা কোরো। তোমার স্নেহের গুণে—তোমার প্রাণের গুণে,—তোমার সকলকে

আপন করার গুণে,—যেন সকল ঝগড়া কলহ মিটে যায়। দুই পক্ষের যত ক্ষোভ ও রাগ যেন তোমাকে লঙ্ঘন কোর্‌তে না পেরে ব্যর্থ হোয়ে ফিরে যায়। তুমি তাঁদের অভিমান ও রাগের পথ স্নেহ দিয়ে আট্‌কিয়ে রেখ।

নূতন বাড়ীতে যেয়েই একবার দে'খ বাড়ীটা পরিষ্কার আছে কিনা, ঘরের জিনিষপত্র গুছোনো আছে কি না। বই টই থালা, বাসন, কাপড়, তোড়ঙ্গ, সিন্ধুক প্রভৃতি কি ভাবে আছে। তার পর তোমার সোণার বালা-পরা হাত দুখানি কাজে লাগিয়ে দিও। কোন্ জিনিষটা কোথায় থাক্‌লে ভাল মানাবে, একবার ভেবে রেখ। বাড়ীর খাটের তলায় আলো রৌদ্র ঢোকে কিনা, কিংবা বাড়ীর এমন কোনো আঁধার কোণ আছে কিনা যেখানে কীট পতঙ্গ গা ঢাকা দিয়ে থাক্‌তে পারে, বহুদিনের আবর্জ্জনা কোন খানে জমে আছে কিনা— প্রত্যেকটি কোনাচ ও ঘরের মেঝোর প্রত্যেক অংশে রোজ ঝাঁট পড়ে কি না; জিনিষপত্র যেমন

কাঠ, লোহা প্রভৃতি অনেক দিন হোতে এক জায়গায় সঞ্চিত হোয়ে আছে কিনা—এই সকল বাড়ী ঢুকেই দেখ্‌তে থেকো, এবং তোমার দ্বারা—নূতন বউএর লজ্জা সংকোচ বজায় রেখে যতটা হোতে পারে—পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে ততটা মনোযোগ দিও। কনে বউএর মত,—মৃত্নভাবে কাজ ক'রতে শিখ, বাহাদুরী দেখাবার উৎকট চেষ্টা কোরো না,—তা হোলে তোমার পায়ের আলতার রং সত্যই লক্ষ্মী ঠাক্‌রুণের পদ্মাসনের মত দেখাবে। তোমাকে দেখে সকলেই ভাব্‌বে তিনিই বাড়ীতে এসেছেন।

আমি জানি এক বাড়ীতে এমনই এক কনে বউ এসে সেই সংসারে একটা নূতন শ্রী দেখিয়েছিলেন। তার জন্য যে ঘরখানি হোয়েছিল, তার অল্প জিনিষপত্র তাঁর হাতের গুণে এমনই সুন্দর হোয়ে থাক্‌তো—যে বাড়ীর অপর সকলে পরিচ্ছন্নতার একটা নূতন আদর্শ পেলে; তাঁর হাত দুখানি যেন প্রদীপ ধোরে আঁধার ঘর কিরূপে আলো করা

যায় তা দেখিয়ে দিলে; এতদিন যে সকল আবর্জ্জনা—যা সকলে দেখেও দেখ্‌তে পান নি, তার উপর নূতন ভাবে দৃষ্টি পোলো,—তার ঘরটি যেমন সাজ সজ্জায় সুন্দর দেখ্‌তে হোল—সবাই তার অনুকরণ করিতে লাগ্‌লো; সামান্য একটু সাবান দিয়ে বিছানার চাদর খানি ধব্‌ধবে করা যায়; সামান্য একটি চোখের কঠোর ইঙ্গিতে ছেলেরা ধূলো মাখা পায় বিছানায় উঠ্‌তে ভয় পায়, ঘড়ীটা বইখানা, ছুড়ি কাঁচি নিয়ে নাড়াচারা কর্‌তে ভয় পায়; সেই চোখের ইঙ্গিত কেমন কোরে কর্‌তে হয়, কনে বউ তা' জান্‌তেন,—কিন্তু যাঁরা তাঁর চাইতে ঢের বয়সে বড়, এবং যারা চোখের চাউনি দিয়ে শাসন না কোরে এযাবৎ কেবল চুলের মুঠি ধরে পিঠে দমাস্ দমাস্ কিল মেরে ছেলেদের সংশোধন কর্‌তে পারেন নি, তাঁরা বিস্ময়ের সহিত দেখ্‌তে পেলেন, মৃদুস্বভাব কনে বউ কথা না কোয়ে কেমন চোখ দিয়ে শাসন কর্‌তে পারেন!

এ ছাড়া যদি বাড়ীর কে কি খেতে ভালবাসেন, কোন জিনিষটা কার মুখে ভাল লাগে না—এ বুঝে শুঝে যদি গোড়া থেকেই রান্না ঘরের একটু তদ্বির্ করতে স্বরু ক'রে দাও, তা' হোলে সকলেই বলবে ঘরে মা অন্নপূর্ণা এসেছেন। ঠিক্ জেন, তুমিই হচ্ছ হিন্দুর ঘরের আসল দেবতা; তোমার রূপ ধ্যান কোরে ঋষিরা স্বর্গের দেবতা কল্পনা করেছেন; তুমি যখন রান্না ঘরের ভার নিয়ে অন্ন দান করেছ—তাই দেখে অন্নপূর্ণার মন্দির তৈরি হোয়েছে—তুমি কোন্ অচেনা ভব-সমুদ্রের নীচে ছিলে, হঠাৎ একদিন অলংকারের ঝাঁপি হাতে নিয়ে লাল তসর প'রে, সিন্দূর সিঁথিতে মেখে—গৃহস্থের ঘর আলো করে এসে দেখা দিলে, তখনই ঘরে ঘরে লক্ষ্মী পূজা স্বরু হোয়ে গেল; তোমার ছেলে-কোলে করা রূপের ঘটা দেখে "গণেশ-জননীর" রূপ ধ্যানে পাওয়া গেল; তোমার নীরব শক্তি-মত্তার প্রভাব অনুভব কোরে হিন্দুরা দশভুজার স্তোত্র পাঠ শিখ্‌লে। তুমিই হিন্দুর—এই দেবতা, সেই শ্লাঘনীয় পদটি ছেড়ে দিয়ে সাধারণ মানুষ হোয়ে যেওনা।

দীক্ষা নেওয়া

এটি ঠিক যেন—কেউ নিজে খেতে এসেন, কেউ পরকে খাইয়ে সুখী হন্। কেউ নিজের স্বামী পুত্র নিয়ে বড় বাড়ীতে থাক্‌বেন—মটর হাঁকিয়ে চল্‌বেন, দিনরাত্রি এই চিন্তা করেন। কেউ বিদুরের খুদ সকলকে বিলিয়ে খাবেন, নিজে উপোসী থেকে সন্তানদের মত আত্মীয় স্বজন, গরীব দুঃখীকে খাওয়াবেন—এতেই তাঁর মহা সন্তোষ। মোট কথা কেউ ভোগ ক'রতে চান—কেউ ত্যাগের আদর্শ দেখাতে ইচ্ছুক। কেউ স্বামীকে নিয়ে উধাও হোয়ে—তাঁর বাপ মায়ের ঋণ অগ্রাহ্য কোরে—দূর দূরান্তরে সুখ খুজতে স্বাধীনতার আকাশে ছুটে যান—ভাই, বোন্ বাচ্‌লো কি মর্‌লো তার খোঁজ রাখেন না;—কেউ সকলের সুখে নিজে সুখী হন—তাঁর দরুণ কারু প্রাণে এতটুকু জ্বালা না হয়, তাই ভেবে ভেবে পরের পায়ে কোথায় কাঁটা বাজ্‌বে—তজ্জন্য সংসার-পথের কাঁটা তুল্‌তে থাকেন।

তুমি এর কোন্ পথে যাবে—তা' কি বলে দিতে হবে?

মোট কথা ঋষির আশ্রমে যেয়ে ছেলেরা যেরূপ নূতন জীবনের দীক্ষা নিত, বিবাহিত জীবন তোমার পক্ষে সেইরূপ দীক্ষা গ্রহণ। তোমার আত্মার যাতে কোরে বল বৃদ্ধি পায়, যাতে দৈহিক সুখ-দুঃখ অতিক্রম কোরে তোমার ভিতরকার শক্তি পুষ্টি লাভ করতে পারে—বিবাহে সেই দীক্ষা গ্রহণ করবে।

রূপ কথা

আমাদের দেশের কতকগুলি পুরাণো রূপ কথা আছে—সেগুলি প্রায় ১৩।১৪ শত বৎসর যাবৎ এ দেশের মেয়েরা শুনে আস্ছে; তাদের মধ্যে মেয়েদের সেই সবাকার চাইতে বড় শিক্ষা কি রকমের হোতে পারে, তা' গল্পচ্ছলে বুঝানো হোয়েছে।

তার কতকগুলি তোমরা দক্ষিণারঞ্জন বাবুর ঠাকুর' দাদার ঝুলিতে পাবে। এই পুস্তকের একটি গল্পের নাম মালঞ্চমালা, আমরা গল্পটি ছোট-কাল থেকে শুনে এসেছি। গল্পটি মোটেই এখনকার গল্পের মতন নয়। এতে স্ত্রীলোকের চরিত্রটা খুব বড় কোরে দেখান হোয়েছে। এটি সত্যিকার কথার মত একবারেই নয়। এতে মড়া মানুষ জীয়োবার কথা আছে। যার হাত পা' কাটা গেছে তার আবার হাত পা হোয়েছে, গল্পটিতে বাঘ-বাঘিনী মানুষের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কোয়েছে এবং পশুদের প্রাণে বেশ দয়ামায়া আছে—এমন দেখান হোয়েছে : তা ছাড়া ভূত-প্রেত-দানা এসে চিতার পাশে ব'সে মড়া খেতে চেয়েছে, পক্ষীরাজ ঘোড়া আকাশে উড়ে চারদিনের পথ এক মুহূর্ত্তে চলে গেছে ; আরও কত কি আজগুবি কথা আছে। তুমি হয়ত ভাবছ—এতো আরব্য উপন্যাসের গল্পের মত—কল্পনায় গড়া—এতে আবার সত্যিকার শিক্ষা কি থাক্‌তে পারে ? এ সকল গল্প বোলে মায়েরা

দুষ্টু ছেলেদের ঘুম পাড়ান—ভূতের কথা শুনতে শুনতে ভয়ে চোখ দুটি বুজে আসে—শেষে ঘুমটি বেশ পেকে যায়। একথাও ঠিক্ বটে, কেবল ভয় দেখাবার কথা নয়, এই গল্পে শিশুদের কৌতুক ও আমোদ দেবারও অনেক কথা আছে। ধর না একটা জায়গা, যেখানে মালঞ্চমালা তাঁর শিশু-স্বামীকে লেখাপড়া শেখাবার জন্য বড় ভাবিত হোয়ে পড়েছেন, কেমনা তার বয়স পাঁচ অতিক্রম কোরেছে। মালঞ্চ-মালা বন ছেড়ে লোকালয়ে যাবেন মনে মনে ঠিক কোরেছেন ; তখন বুড় বাঘটা এসে বল্লে "পণ্ডিতের ভাবনা কি ? এই বনে কত পণ্ডিত সাঁজে সকালে ঘোরে, হুক্কা হুয়া করে, বল তাদের একজনকে এনে দি।"* এই কথা শুনে ছেলের দল হো হো কোরে হেসে উঠ্‌বে কি না ? আবার মালঞ্চ-মালা এক নগরে গিয়ে মালিনী মাসীকে জিজ্ঞাসা কচ্ছেন "এখানে পাঠ-শালা আছে কি ?"

* ঠাকুরদাদার ঝুলি—মালঞ্চ-মালার গল্প।

মালিনী বল্লে "কেন রাজার বাড়ীর পণ্ডিত কত পড়ুয়া পড়ায়। কুঁজো, নুলো, গেঁগো, গোদা কত পড়ুয়া! আবার রাজার রাজপুত্তুরও আছে। দিনরাত ছিলিমিলি কিলিমিলি, কাকবগের হাট।"* একথা শুনেও ছেলের দল হেসে উঠ্‌বে কি না বল।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে এ শুধু আরব্য উপন্যাসের মত দৈত্য-দানা নিয়ে গল্প নয়। এতে ছেলেদের আমোদ দেওয়ার কথা অনেক আছে। কিন্তু আরব্য উপন্যাস তো আর কচি ছেলে-মেয়ের হাতে দেওয়া যায় না। তার ভিতরে অনেক কথা এমন আছে যা ছেলে মেয়েদের অল্প বয়সে না শোনাই ভাল।

কিন্তু মালঞ্চ-মালার গল্পটী আগাগোড়া নিখুঁৎ— উহা ছেলেদের হাতে দেবার জিনিশ। কেবল তাই নয়, এই গল্পে যে উচ্চ শিক্ষা-দীক্ষার কথা আছে, তা পড়্‌লে বুড়োদেরও অনেক নূতন তত্ত্ব শেখা

* ঠাকুরদাদার ঝুলি—মালঞ্চ-মালা।



হবে। এতে পাড়াগেঁয়ে মেয়েদের যে ছবি আঁকা হোয়েছে, তার চাইতে মহৎ কিছু কল্পনা করা যায় না। এতে হৃদয়ের বল ও নিঃস্বার্থ ভালবাসার যে মূর্ত্তি দাঁড় করান হোয়েছে, তার কাছে সীতা সাবিত্রীও যেন ম্লান হোয়ে পড়্বেন। এই গল্পটি অতি সংক্ষেপে বোলে তোমার কাছে এর গুণাগুণ পরে বিচার করবো।

মালঞ্চ-মালার গল্প

বহু তপস্যায় এক আটকুঁড়ে রাজা দেবতাদের কাছে বর পেলেন, তাঁর একটি ছেলে হবে। সমস্ত রাজপুরীটা সেই ছেলেটির জন্য মায়ের মতন পথ-পানে চেয়ে রইল। রাজপুত্র জন্মালেন। তাঁর নাম হোল চন্দ্রমাণিক। কিন্তু ষষ্ঠীর দিন বিধাতা পুরুষ তার কপালে লিখে গেলেন, অমন সুন্দর ছেলের আয়ু মাত্র ১২ দিন।

এই লেখার কথা প্রকাশ হোয়ে পড়্লো। রাজ-পুরীর সকল লোক দেবতাদের কাছে ধন্না দিল—কি কোরে রাজকুমারের আয়ু বৃদ্ধি পায়, তার উপায় কোরে দাও।

আদেশ হোল ঠিক্ সেই দিন যে মেয়ের বার বছর পূর্ণ হোয়েছে—এমন একটি মেয়ের সঙ্গে যদি সেই আতুর ঘরের শিশুটির বিয়ে দেওয়া হয়, তবেই তার রিষ্টি কেটে যেতে পারে। তেমন ধারা রাজকন্যা ত পাওয়া গেল না, সুতরাং কোটালের বার বছরের পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল, তার সঙ্গেই অগত্যা শিশু-রাজপুত্রের বিয়ে হোয়ে গেল।

কিন্তু রাজারও ইচ্ছা ছিল না, রাণীরও না, একটা কোটালের কন্যা সে হবে রাজ-ঘরের বউ!

কোটালের স্ত্রী শুন্ছিল, রাজ পুত্তুরের আয়ু সবে বারদিন। সে বল্ল—"হোক্ না রাজপুত্তুর, আমি এখানে মেয়ে দেবো না।"

মালঞ্চ বোল্ল "রাজা যখন বলেছেন তখন আমায় বে দাও।"

কিন্তু তিনি রাজাকে জিজ্ঞাসা কোরে পাঠালেন রাজপুত্তুর কোটালের বাড়ীতে আসতে অনুমতি পাবেন কি না, রাজা-রাণী বউএর হাতের ভাত খাবেন কি না, বউএরা বিয়ের সময় যে সকল যৌতুক পেয়ে থাকেন, মালঞ্চকে তা' দেওয়া হবে কি না ?"

ইহা ছাড়া মালঞ্চ আর এক সর্ত্ত চাইলেন, রাজপুত্তুর যদি আতুর ঘরে ম'রে যান, তবে শব মালঞ্চকে দিতে হবে।"

বউ নয় ডাইনি

রাজা বল্লেন—"বাসর ঘরে এ সকল কথা স্বীকার করবেন। কিন্তু মালঞ্চের বিয়ে হওয়ার পরেই রাজপুত্তুর মারা গেলেন। রাজা বল্লেন— "এত বউ নয়, এ ডাইনি।"

যা স্বীকার করেছিলেন মালঞ্চ একে একে সকল কথা মনে করিয়ে দিলেন। রাজা রেগে তার হাত

কেটে ফেল্লেন, চোখ উপ্‌ড়িয়ে ফেল্লেন, তার বাপ্‌কে কাটলেন। কিন্তু মালঞ্চ তথাপি যেন কিছু হয় নাই, এম্‌নি ভাবে বল্লেন,—"রাজা আমায় কথা দিয়েছেন, মরা স্বামী আমায় দিন্‌।" রাজা মরা রাজ-পুত্তুরের সঙ্গে ডাইনী মালঞ্চকে পুড়িয়ে ফেল্‌তে আদেশ কল্লেন।

ধূ ধূ করে চিতা জ্বল্‌ছে—তার মধ্যে মরা স্বামী কোলে করে মালঞ্চ বসে আছে। ভূত প্রেত দানা এসে কত ভয় দেখাচ্ছে, কত লোভ দেখাচ্ছে, মালঞ্চ কিছুতেই স্বামীকে ছেড়ে দিলে না, সেই শিশু স্বামীকে আঁকড়িয়ে ধরে বসে রইল।

আগুণ নিবে গেল, দানা ভূত বাতাসে মিলিয়ে গেল। মালঞ্চ দেখ্‌লেন, তাঁর ফুট ফুটে ছোট্ট স্বামিটি কোলে নিয়ে তিনি মস্ত বড় একটা প্রান্তরে ব'সে আছেন। দেবতার আশীর্ব্বাদে তার চোখ হোয়েছে, তাঁর চাঁপার মত আঙ্গুল গুলি ফিরে পেয়েছেন, আরও আশ্চর্য্যের বিষয় সেই ছোট্ট রাজপুত্রটী চোখ মেলে হাত পা নাড়্‌ছে।

সম্মুখে রূপার কাজল লতা, ঘন ফোড়ের কাঁথা, সোণার উম্নুন, মুক্তোর ঝিনুক, শ্বেত সর্ষের বালিশ, মতির চামচ্। তার পরে সেই ছোট্ট স্বামীকে নিয়ে সেই প্রান্তরে তিনি কি ভাবে ছিলেন, তা সেই আদত গল্প থেকে তুলে দেখাচ্ছি :—

"পতি হাসেন—মালঞ্চ হাসেন, পতি কাঁদেন মালঞ্চ কাঁদেন, পতি কথা কয়, মালঞ্চ কথা কন। পতি হাত পা নাড়ে, মালঞ্চ বসিয়া খেলা দেন। মালঞ্চ চোখের জলে পতিকে নাওয়ান, মাথার চুল গুছায়ে পতিকে মুছান, মুখের বাতাস দিয়ে পতিকে শুকান, আঁচল খানা দিয়ে বেড়িয়ে পতিকে বুকের মধ্যে করে বসে থাকেন।" *

বাঘ মামা

কিন্তু দেবতার আশীর্ব্বাদী দুধ টুকু ফুরিয়ে গেল, চন্দ্রমাণিককে কি খাওয়াবেন,—ভেবে ভেবে মালঞ্চ আকুল।

* ঠাকুর দাদার ঝুলি—মালঞ্চমালার গল্প।

✻ গায়ে হলুদ ✻

"এক ফোটা দুধ যদি প্রাণ দিলে পাই সেই দুধ খাওয়াইয়ে স্বামীকে বাঁচাই। জন মানুষের বসতি পাই, গাই বিয়োনো দুধ পাই।"

মালঞ্চ চল্লেন, "চল্‌তে চল্‌তে চল্‌তে চল্‌তে সেই নিলক্ষ্যের চড়ায় শিশু সোয়ামীর মুখে রৌদ্র লাগে, আঁচল দিয়ে ঢেকে নেন; বৃষ্টি মাথায় পড়ে, বুক দিয়ে আবরিয়ে রাখেন, ধূলাবালী উড়ে আসে, চুল ছড়িয়ে পাখা ধরেন—এই ভাবে চল্‌তে চল্‌তে দুই পা যান, আর নামিয়ে নামিয়ে বাতাস করেন—চ'লে চ'লে সোয়ামী নিয়ে মালঞ্চ এক গহন কাননে গিয়ে ।.লেন।"

মালঞ্চ এর পর বাঘ-বাঘিনীর রাজ্যে এসে পড়্‌লো,—তাদের দয়া হ'ল; বাঘ-বাঘিনী মামা মামী হ'ল—চন্দ্রমাণিক বাঘিনীর দুধ খেয়ে মানুষ হ'ল।

✻ ঠাকুরদাদার ঝুলি—মালঞ্চমালা।

বোন্‌ঝি

পাঁচ বছর পড়্‌তে পড়্‌তে স্বামীকে লেখাপড়া শেখাবার উপায় খুজ্‌তে মালঞ্চ—সেই আশ্রয় ছেড়ে এক রাজার রাজধানীতে এসে উপস্থিত হ'লেন। এক মালিনীর বাগানে শিশু চন্দ্রমাণিককে নিয়ে দাঁড়াতেই রূপে সে জায়গাটা আলোকিত হ'ল। শুক্‌নো ডালে ফুল ফুট্‌লো ; শুক্‌নো লতায় পাতা গজালো। মালিনী তাকে আদর করে বোন্‌ঝি বলে বাড়ীতে রাখ্‌লেন। মালঞ্চের আঁচলে বাঁধা একখানি হীরা ছিল, তা' দেবতারা তাঁকে দিয়েছিলেন, সুতরাং তাঁর টাকার অভাব হোল না। তিনি মালিনীর বাড়ীতে বেশ কয়েক খানি ঘর করালেন, ও চন্দ্রমাণিককে রাজার বাড়ী পড়্‌তে পাঠালেন।

কিন্তু মালঞ্চ আর স্বামীকে মুখ দেখান্‌ না, পাছে 'মা' ডেকে ফেলে। তিনি রেঁধে বেড়ে চলে যান, মালিনী কাছে বসে খাওয়ায়, মালঞ্চ বেড়ার ফাঁক দিয়ে তাকে দেখ্‌তে থাকেন।

কাঞ্চীর কথা

ক্রমে চন্দ্রমাণিক বড় হ'ল। রাজকুমারী কাঞ্চী তার সঙ্গে এক পাঠশালায় পড়্‌ত, সে চন্দ্রমাণিককে দেখে লেখাপড়া ছেড়ে দিল, তার ভাই সকল বল্লে, "তুই পড়া ছাড়্‌লি কেন?" কাঞ্চী বল্লে,—তোমরা আমার ছয় ভাই, আমি তোমাদের এক বোন, আমার কথা রাখ্‌বে কি না, বল। আমাকে চন্দ্রমাণিকের সঙ্গে বিয়ে না দিলে আমি প্রাণ রাখ্‌ব না।"

তারা দে'খল প্রমাদ। পরদিন চন্দ্রমাণিককে বল্লে,—"দেখ্‌ মালীর ছেলে, তুই এই ময়লা পোষাক পরে এলে তোকে রাজবাড়ীতে ঢুক্‌তে দেব না; কাল যদি রাজপুত্তুরের মত পোষাক পরে না আস্‌তে পারিস্‌, তবে তোকে কেটে ফেল্‌ব।"

চন্দ্রমাণিক বাড়ী ফিরে এসে উঠোনে উপুর হয়ে পড়ে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল, মালঞ্চ বল্লেন,—"দেখ তো মাসী ও কাঁদ্‌ছে কেন?"

সব শুনে তিনি ভাল পোষাক কিনে এনে

চন্দ্রমাণিককে দিলেন। তাই পরে হাসীখুসী হোয়ে সে পাঠশালায় চলে গেল।

পরদিন আবার ছয় ভাই বল্লে,—"খুব ঘটা কোরে দোলায় চৌদ্দলায় চড়ে না এলে তোকে কেটে ফেল্‌ব।"

চন্দ্রমাণিককে মালঞ্চ সেই রূপ কোরে পাঠশালায় পাঠালেন। তার পর রাজপুত্রেরা বল্লে,—"তুই একটা ঘোড়ায় চড়ে সব্বাএর পেছনে থাক্‌বি, আমরা ছয় জনে ছয় ঘোড়ার পিঠে তোর থেকে অনেক এগিয়ে থাক্‌ব, কিন্তু তুই যদি সব্বাএর আগে যেয়ে রাজপুরীতে ফিরে না আস্‌তে পারিস্‌, তবে তোকে কেটে ফেল্‌ব।"

মালঞ্চ তিন দিনের জন্য বিদায় নিলেন, শ্বশুর বাড়ীতে এসে দেখেন সেখানে পক্ষীরাজ ঘোড়া পাগল হ'য়ে অনেক লোকজন নষ্ট করেছে। তার ভয়ে সকলে দোর বন্ধ করে রেখেছে। তিনি পক্ষী-রাজকে ডাক্‌তেই সে ছুটে এল। তাকে নিয়ে এসে মালঞ্চ চন্দ্রমাণিককে দিলেন।

ঘোড়া দেখে ভয় পেয়ে মালিনী তার উপর চন্দ্রমাণিককে চড়াতে কবুল হ'ল না। অনেক বছর পরে অগত্যা মালঞ্চ স্বামীর কাছে এলেন, তার জুতার ধূলো মোছাবার ছলে পায়ের ধূলো মাথায় নিলেন, একবার স্বামীর মুখখানি চেয়ে দেখ্‌লেন তার পর মাথা নোয়ালেন। চন্দ্রমাণিক বল্লে,—"তুমি আমার কে? বাঁধ বাড়, কাছে এস না—তুমি কে?"

চোখ দুটি নত ক'রে মালঞ্চ বল্লে,—"আমি মালঞ্চ।"

তার পর পক্ষীরাজের জোরে চন্দ্রমাণিক জয়ী হ'ল। সে রাজ-বাড়ীতে ফিরে আস্‌তেই কাঞ্চী তাকে মালা গলায় পরিয়ে দিল। সে রাজকন্যাকে বিয়ে কল্লে।

দাঁতভাঙ্গা

ঘোড়া এসে মালঞ্চকে সব বল্লে। মালঞ্চ দুঃখ কল্লেন না। মালিনীকে বল্লেন,—"আজ আমার বড় সুখের দিন,—আজ আমার সব কাজ ফুরিয়েছে।"

মালিনীকে তাঁর যা কিছু ছিল সর্ব্বস্ব দিলেন। এবং ঘোড়াকে একখানি চিঠি দিলেন—তার শ্বশুরকে দিতে। তাতে লিখ্‌লেন,—"তোমার ছেলে রাজকন্যা কাঞ্চীকে বিয়ে করে সুখে আছে,—আর আমার কথা কি লিখ্‌ব; যেদিন মহারাজ আমায় সাধু সরোবরের পাড়ে প্রথম দেখেছিলেন, সেদিন আমার বড় সুখের দিন ছিল। এই চিঠি পেয়ে দয়া করে সেই সরোবরের জলে আপনার পা দু'খানি ধুইবেন, তা'হোলেই আমি জুড়োবো।"

তার পর মালঞ্চ বাঘের রাজ্যে এসে তাদের মুখে শুন্‌লে, চন্দ্রমাণিক রাজকন্যাকে বিয়ে করেছে সত্য, কিন্তু মালীর ছেলে রাজকন্যাকে বিয়ে কল্লে তাকে ১২ বছর জেলে থাক্‌তে হয়। আবার মালঞ্চ উঠে দাঁড়ালেন, বাঘের যাদু মাথায় কোরে নিজে অদৃশ্য হোয়ে রাজপুরীতে ঢুক্‌লেন, চন্দ্রমাণিকের পায়ে লোহার বেড়ি। সে ঘুমিয়ে আছে, তিনি বেড়ীর এক একটী শিকল কাট্‌তে আটটি করে দাঁত ভাঙ্গ্‌লেন। শেষ রাত্রে ৩২টী দাঁত বিসর্জ্জন দিয়ে

তিনি বেড়ীর সব গুলি শেকল কাট্‌লেন, তখন তিনি অজ্ঞান হোয়ে পড়্‌লেন,—চন্দ্রমাণিক ঘুম ভেঙ্গে দেখেন তার পায়ের বেড়ী খোলা,—আঁধারে মালঞ্চকে দেখ্‌তে পেলেন না ,—তিনি বের হোলেন। এদিকে চন্দ্রমাণিককে নিতে তার পিতা মহারাজ এসেছিলেন, কিন্তু কাঞ্চীর বাপ তাকে যুদ্ধ কোরে হারিয়ে দিয়ে বন্দী করে রেখে দিলেন। মালঞ্চের বাঘেরা এসে কাঞ্চীর বাপ ভাই সবাইকে খেয়ে ফেল্লে, তখন মালঞ্চ অজ্ঞান হোয়েছিলেন, তা' জানতে পারেন নি, তাদের জন্য কত কাঁদলেন। কাঞ্চীকে বাঘেরা খেয়ে ফেল্‌তে চেয়েছিল, তাঁর চন্দ্রমাণিক তাকে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু মালঞ্চ তাদেরে অনেক মিনতি করে বারণ কল্লেন। চন্দ্রমাণিককে ও কাঞ্চীকে নিয়ে রাজা নিজ পুরীতে গেলেন, পথে মালঞ্চ কত কান্না কাটি কল্লে, কিছুতেই রাজা তাঁকে নিলেন না। মন্ত্রীরা কত বুঝাল,—কিন্তু তিনি বল্লেন, "রাজকন্যা পেলেম বো, কোটাল কন্যা ফেলে থো।"

রাজবাড়ীতে

কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে কাঁটা বন ভেঙ্গে রাজপথ ছেড়ে দিয়ে বিপথ দিয়ে মালঞ্চ তাঁর শ্বশুরের পুরীতে গেলেন। বাঘেরা অনুমতি চাইল, রাজাকে শাস্তি দিয়ে চন্দ্রমাণিককে তাঁর হাতে দিতে। তিনি বল্লেন, "এ কথা মুখে বল্‌তে নাই, আমি ঘুঁটে কুড়িয়ে খাব, তবুও শ্বশুরের ভিটা আমার পবিত্র। আমি যেখানে সেখানে পড়ে থাক্‌ব, তবু এই পুরীর হাওয়া আমার গায়ে লাগ্‌বে।"

তিনি রাত দুপুরে পা টিপে টিপে রাজপুত্তুরের ঘরে যেয়ে দেখেন সোণার দীপ জ্বল্‌ছে, চন্দ্রমাণিক ও কাঞ্চী ঘুমোচ্ছে। তাদের রূপ দেখে তাঁর চক্ষু জুড়ালো, তিনি নীরবে তাদের আশীর্ব্বাদ কল্লেন "এই রাজপুরীর চূড়া যেন অজয় হোয়ে থাকে। হে রাজপুত্র, হে রাজকন্যা, তোমরা সুখে থেক। আমি যদি পশু পাখী হ'য়ে থাকি, তবু আমি তোমাদের সুখ দেখ্‌লে সুখী হোব।"

রোজই এই রকম কোরে এসে একবার দেখে যান এবং আশীর্ব্বাদ কোরে যান, একদিন ধরা পড়ে গেলেন ; তখন তার শ্বশুর তাকে পুরী হোতে নির্ব্বাসন কোরে দিলেন।

নির্ব্বাসিত হোয়ে মালঞ্চ পুকুরে প্রাণ দিতে যান, দেখেন শ্বশুর তার পাড়ে কাঁটার বেড়া দিয়ে রেখেছেন। মালঞ্চ ভাবেন, আমার দুঃখ দিতেই বা আর কে আছে ? শ্বশুরের পায়ের উদ্দেশে প্রণাম করেন।

মালঞ্চকে তাড়া'বার পরে, রাজবাড়ীতে নানা রূপ বিপদ হোল,—কাঞ্চীর যে সকল ছেলে মেয়ে হ'ল, তা' মরে গেল। রাজা শিকার কর্ত্তে গেলেন, সেখানে তাঁর সৈন্য সামন্ত বাঘে খেল। বড় তৃষ্ণার্ত্ত হোয়ে রাজা দেখেন একটী পুকুর ধারে লক্ষ্মী-ঠাকরুণের মত সুন্দর স্ত্রী। রাজা জল চাইতে মেয়েটি তাকে জল দিল, রাজা বল্লেন, "মা তুমি জল দিয়ে আমায় বড় সুখী কল্লে, তুমি সুখী হও।" এই কথা শুনে মালঞ্চ কেঁদে তার পায়ে পড়্লেন, এবং

বল্লেন, "আমার আর এর চাইতে কোন্ সুখ বেশী হ'তে পারে ? আজ আমি তোমার মুখে প্রথম মিষ্ট কথা শুনলেম।" রাজা মালঞ্চকে চিন্‌তে পেরে তাকে আদর করে বাড়ীতে ফিরিয়ে আন্‌তে চাইলেন। কিন্তু মালঞ্চ বল্লে—"এই বনে আমি তোমার মুখে মিষ্ট কথা শুনলেম, এই বন আমার বাড়ী—এত সুখ যেখানে পেলুম, সে জায়গা ছেড়ে যাই কি ক'রে ?

পাটরাণী আর ঠাকুরাণী

যাহোক, মালঞ্চ আর কয়েকদিন পরে শ্বশুর বাড়ী যাবেন স্বীকার কোরে রাজাকে বিদায় দিলেন। এই কয়েক দিনের মধ্যে তিনি কাঞ্চীর বাপের বাড়ীতে যেয়ে তপস্যার দ্বারা মরা রাজকুমার ও রাজাকে বাঁচালেন, মালিনীকে সঙ্গে নিলেন, বাঘেরা সঙ্গে জুটল। এদিকে রাজা মালঞ্চকে আদর করে বাড়ীতে আনার জন্য আয়োজন করতে লাগলেন, রাজবাড়ীতে ডঙ্কা বেজে উঠল।

মালঞ্চ পুরীতে আস্‌ছেন, যিনি স্বামীকে শ্মশান

হোতে বাঁচিয়েছেন, যিনি রাজাকে কারাগার হোতে মুক্তি দিয়েছেন, যিনি মড়া বাঁচিয়েছেন, সবার চাইতে যিনি শ্বশুরের শত অত্যাচার কথাটি না ক'য়ে সয়েছেন, তাকে ঘৃণার বদলে পূজা দিয়েছেন, সেই মালঞ্চের জন্য রাজবাড়ীতে নূতন এক সিংহ-দরজা উঠল, ঘরে ঘরে কলাগাছ পোতা হ'ল। রাস্তায় সিন্দূর চন্দনের আঁক পড়ল। যে যেখানে মরেছিল, তাদেরে বাঁচিয়ে মালঞ্চ, কাঞ্চীর পিতা ও ভেয়েদের সঙ্গে নিয়ে শ্বশুরের ভিটায় এলেন। রাজা প্রজা একত্র হ'য়ে তাঁর আদর অভ্যর্থনা কল্লেন।

তার জন্য কাঞ্চী যে ফুলের মালা গেঁথে রেখেছিল, তা তিনি কাঞ্চীর গলায় পরিয়ে দিয়ে তাকে কল্লেন পাটরাণী। আর রাজ্যের যত লোক তাকে করল্ ঠাকুরাণী।

গল্পের নীতি

এই গল্পটি ছোট বেলা শুনেছিলুম। কিন্তু দক্ষিণা বাবু এটি ঠিক বুড় স্ত্রীলোকের মুখে যেমন

শুনেছিলেন, তেমনি কোরে লিখেছেন। তা' এমনই চমৎকার হোয়েছে, যে পড়্‌লে তুমি না কেঁদে থাক্‌তে পার্‌বে না। আমি তো অতি সংক্ষেপে গল্পটি বলে গেলুম, তুমি আদত গল্পটি প'ড়। গল্পটি খুব বড এবং একখানি কাব্যের মত, হিন্দু স্ত্রী কত সইতে পারে, দুঃখ স'য়ে কেমন করে দেবতা হোতে পারে, এই গল্পটি পড়্‌লে বুঝ্‌তে পার্‌বে।

মালঞ্চ ঠিক তোমার আমার মতন লোক নয়। সে জন্মেছিল দেখাতে যে শরীরটা মানুষের বল ও সদ্‌গুণ দেখাবার একটা উপায় মাত্র।

সে কোটালের কন্যা, রাজা তাকে পুত্রবধূ কল্লেন। সে রাজবধূ হবে, কিন্তু হেলার—অশ্রদ্ধার পদ সে চায় না। সে ঐ পদের ভিখারী নয়। যদি রাজা তাকে পুত্রবধূ কর্‌বেন, তবে তাকে পুত্রবধূর সব খানি গৌরব দিতে হবে। রাজ-সংসারে যেয়ে যদি সে কাঠ-কুড়োনির মত অনাদরে পড়ে থাক্‌বে, তা'হলে সে সেই সংসারে যে কাজ কর্‌তে যাবে, সকলের হিত কর্‌তে যাবে—সে কর্ত্তব্য তো রাজবধূর যোগ্য সম্পূর্ণ

সম্মান না পেলে সে কর্ত্তে পারবে না। তুমি যদি তাঁকে বউ ক'রে ঘরে নিবে তবে বউএর সম্মানটি তাকে দিতে হবে। এজন্য সে বিয়ের আগে বলে পাঠালে—রাজা তাকে বাসরের দান দেবেন কিনা, তার হাতে খাবেন কিনা ইত্যাদি। যখন রাজা বিরক্ত হয়ে তার হাত কাটলেন, চোখ উপড়ালেন, তখনও সে একটি একটি করে তার দাবীর কথা কইতে লাগ্‌লো। কিন্তু সে তো আর তোমার আমার মত লোক নয়, সে দেহটা মনের একটা বাহন বলে মনে করে, দেহের সুখ দুঃখ গ্রাহ্যের মধ্যেই নেয় না। যা' ভাল তা' সে করবে—দেহ যা'ক আর থাক্।

তার পর স্বামী নিয়ে যখন সে চিতায় উঠ্‌ল, তখন দৈত্য দানা এসে ভয় দেখালে, লোভ দেখালে। তোমরা বড হোলে পড়বে, বুদ্ধদেব সিদ্ধিলাভ করবার পূর্ব্বে এমনি লোভ ও ভয়ের সব মূর্ত্তি দেখেছিলেন, তাতে তিনি বিচলিত হ'ন নি। মালঞ্চও হ'ল না। যারা দেহকে অগ্রাহ্য ক'রে সত্যিকার জীবনের পথে যাত্রা করে—তাদের

পেছনে অপদেবতারা এমনই করে উপদ্রব করে থাকে।

মালঞ্চের চোখ গেছিল, তিনি চোখ পেলেন, হাত গেছিল, হাত পেলেন—কেন জান? তিনি স্বামীকে দেখ্‌তে চেয়েছিলেন, এজন্য দেখার শক্তি হ'ল। তার সেবা কর্‌তে চেয়েছিলেন, এ জন্য হাত হ'ল। মঙ্গলের ইচ্ছা নিয়ে যদি কেউ এমনই তপস্যা করে উপায় খোঁজে, প্রাণপণে যদি কেউ কিছু চায়, তা তার হাতে আসে। এই হচ্ছে ঈশ্বরের বিধান, এটি কেমন করে যে হয় তা বল্‌তে পারি না। পীপঁড়াটা পায়ে দলিত হ'য়ে প্রাণান্ত কষ্ট যখন নিবেদন করে, তখন ভগবান কি ক'রে যে তাকে দুটি পাখা দেন, তা বল্‌তে পারি না। কিন্তু এরূপ কোন আইন যে সংসারের সকলের চক্ষু এড়িয়ে কাজ কচ্ছে, তা আমার কাছে মোটেই অসম্ভব বলে মনে হয় না।

সাংসারিক সুখ দুঃখ বা বিপদ মালঞ্চ মোটেই গ্রাহ্য কর্ত্তেন না। তিনি পথে চলার জন্য পথে

চলেন নাই, কোন একটা জায়গায় যেয়ে পৌঁছাবেন, এজন্য পথে চলেছিলেন। সুতরাং একটু আরামের জায়গা পেলেই যে তিনি থেমে পড়বেন,—তা' নয়। এজন্য দেখা যাচ্ছে, বাঘদের রাজ্যেতে যেয়ে ঘোর বিপদের পরে তিনি মামা মামি সম্পর্ক পাতিয়ে বেশ একটু সুখে ছিলেন, এমন কি তিনি তাদের সাহায্য নিয়ে অনায়াসে রাজপুরী দখল করে স্বামীকে নিয়ে ঘর-সংসার কর্ত্তে পার্‌তেন। কিন্তু যখন দেখলেন, রাজপুত্রের সমস্ত দায়িত্ব তাঁর উপর, তাকে শিক্ষা দিতে হবে—তখন গড়া ঘর ভেঙ্গে আবার নিঃসহায় অবস্থা বরণ করে শিশুস্বামীকে নিয়ে যে দিকে চোখ যায় সেই দিকে চল্লেন। তুমি দেখ্‌তে পাচ্ছ না, এ মেয়েটি বড় সহজ মেয়ে নয়। এ কারু সঙ্গে ঝগড়া করে না, কেউ চোখ উপড়ে ফেল্লে কথাটি বলে না। কিন্তু যা ভাল মনে করেছে, তা সে কর্‌বেই। তাতে যে বিপদ্‌ আসুক না কেন, সুখ দুঃখ সে গণনার মধ্যেই আনে না—সে সংসারকে কর্ত্তব্য করবার জায়গা বলে মনে করেছে, এখানে

স্নেহ ও ত্যাগের সাধনা সে করবে, এটি তার কাছে তীর্থ।

যেদিন সে শুনতে পেল যে কাঞ্চীর সঙ্গে রাজপুত্তুরের বিয়ে হয়ে গেছে, সেদিন সে এক হাতে চোখের জল মুছলে, অপর হাত উঠিয়ে তাদের আশীর্ব্বাদ কল্লে। মালিনীকে বল্লে, "আজ আমার বড় সুখের দিন; আমি যার সুখের জন্য এত কল্লুম সে আজ সুখী হোয়েছে, এর চাইতে আর সুখের বিষয় কি হোতে পারে?" বাঘবাঘিনীকে যেয়ে বল্লে, "তোমরা আজ আমায় খাও; আমার জীবনের কাজ শেষ হয়েছে।" শ্বশুরকে চিঠি লিখলে,—"সাধু-সরোবরের জলে তোমার পা'দুখানি ধু'য়ো তা হ'লে আমি কৃতার্থ হব।"

সেই পুকুরের জল যে তার প্রাণের মত, সেখানে শ্বশুরের পা-দুখানি পড়লে যেন তার প্রাণের উপর পড়ে সব জ্বালা জুড়িয়ে দেবে।

কিন্তু তার কাজ একদিনের তরেও শেষ হয় নি। যেই শুনল চন্দ্রমাণিক বন্দী, সেই আবার

একি মূর্ত্তি! সমস্তগুলি দাঁত বিসর্জ্জন দিয়ে সে সোয়ামীর পায়ের বেড়ী কেটে ফেল্লে। তুমি কি দেখ্‌তে পাচ্ছ না, যে দেহটাকে মালঞ্চ কেবল সংসারের শুভ কর্‌বার উপায় মাত্র মনে করেছে। এর সুখে দুঃখে মোটেই তাকে পায় নাই। স্নেহের ডাকে সে সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়ে সাড়া দিয়েছে। যখন শ্বশুর বহু কষ্ট দিয়ে শেষে ঘোর বনের মধ্যে তাকে প্রথম আদর কল্লেন; তখন সে বল্লে; "তুমি আমায় আবার কোন রাজবাড়ীতে যেতে বলচ, এই বনই তো আমার রাজবাড়ী। এখানে আমার রাজা-শ্বশুর আমাকে জীবনে প্রথম দিন আদর কোরে ডেকেছেন। এ আমার তীর্থের সমান, আমি এ বন ছেড়ে কি ক'রে যাব?" সুতরাং দেহ সম্বন্ধেও যা, বাহিরের অট্টালিকা সম্বন্ধেও তা;—এ মেয়েটি কেবল আত্মার দিক দিয়ে সব দেখ্‌ছেন।

কাঞ্চী ও চন্দ্রমাণিকের ঘরে নিঃশব্দে গিয়ে মালঞ্চ তাদের যে সরল প্রাণে আশীর্ব্বাদ করেছেন, সেরূপ মালঞ্চ ছাড়া আর কে করতে পারতো? কোথায় কে

এমন শুনেছে বা দেখেছে? রাজপুত্র যখন তাকে ধরে ফেল্লেন, এবং জিজ্ঞাসা কল্লেন "তুমি কে এ ঘরে ঢুকেছ?" তখন মালঞ্চ তার অল্প কথায় একটী ছোট্ট উত্তর দিলেন, "কে ঘরে ঢুকেছে?—যে পারে"

রাজপুত্র বল্লেন, "তুমি যেন আমার কত কালের চেনা! স্বপ্নে মনে হয়, যেন আমি তোমার ঐ দুখানি কোমল হাতের যত্নে মানুষ হোয়েছি।"

তাঁকে যখন রাজা রাজপুরীতে আন্‌তে চেষ্টা কল্লেন, তখন তিনি গেলেন না। আত্মীয় পরিজন সকলের দুঃখ নিবারণ কর্‌তে না পার্‌লে তিনি নিজে সুখ খুঁজে রাজবধূ হোতে যাবেন না। যখন সকলকে প্রাণ দিলেন, তখন সকলের সঙ্গে রাজ-পুরীতে এলেন।

মালঞ্চ প্রথমই যদি রাজপুরীতে স্থান পেতেন, তবে কোটালের কন্যা রাজ-বধূ হোয়েছে, এই একটা খোটা থেকে যেত—এজন্য তখন তাঁকে রাজান্তঃপুরে আমরা না দেখে দুঃখিত হই নাই। যখন সকলে বুঝ্‌তে পাল্লেন, তিনি পৃথিবীর লোক নহেন—স্বর্গের

দেবী,—যখন তার নাম ক'রে রাজডঙ্কায় কাঠি পড়্‌ল, তখন তার আগমন সার্থক হোল—আগে আস্‌লে তাঁর আসা তাঁর যোগ্য হোত না।

শেষের কথাটির মূল্য একটী হীরা, "তিনি নিজে পাটরাণী হ'লেন না, কাঞ্চীকে পাটরাণী কল্লেন," কিন্তু এই ত্যাগের জন্য এই নিঃস্বার্থ স্নেহ-প্রেমের জন্য, এই শত শত অমানুষী গুণের জন্য রাজ্যের লোকেরা তাকে কর্‌ল ঠাকুরাণী। পাটরাণীর পদ লোক-শ্রদ্ধার নীচে পড়ে রইল।

মালঞ্চ ভোগের জন্য সংসারে আসেন নি,—ত্যাগের জন্য এসেছিলেন। এইরূপ দেবতারা সংসারের সুখ চান না এবং পান না, কিন্তু দেবতারা যে পূজো পান, সমস্ত মানবজাতি ঘাড় হেঁট করে তাদের সেই পূজো দিয়ে থাকে। মালঞ্চ শত অত্যাচার সয়ে কথাটি বলেন নি। ফুলকে ছেঁড়, কাট, সে কি কিছু বলে না, তুমি তাকে পিঁষে ফেল, তবু সে সুগন্ধ দেবে। যারা এত অত্যাচার করেছেন, তাদেরেও মালঞ্চ একদিনের জন্য ভালবাস্‌তে ভুলেন

নি। তিনি স্নেহের জন্য সংসারের কাজে নিজেকে দিনরাত্র নিযুক্ত রেখেছেন, কিন্তু এমন কিছু করেন নি, যাতে লোকের মনে জ্বালা উৎপন্ন করতে পারে। তুমি আজ এই শুভদিনে মাথা হেঁট করে মালঞ্চকে একবার প্রণাম ক'রে নেও। সংসারে অনেক রাংতা আছে, তা দেখে ভুল না। এই খাঁটি সোণার মূর্ত্তিব পায়ে প্রাণের পূজো দিলে নিজেও কতকটা উন্নত হোতে পারবে।

তুমি কি মনে কর মালঞ্চমালা আমাদের দেশে একটা কল্পনার জিনিষ। সত্যিকার পৃথিবীতে এমনটি হয় না? এ যদি বুঝে থাক তবে ভুল বুঝেছ, এটা অবশ্য সত্য যে মালঞ্চ নামে কোন কোটাল-কন্যার হয়ত চন্দ্রমাণিক নামক রাজপুত্তুরের সঙ্গে কোন কালেই বিয়ে হয় নাই,—চিতায় উঠে কোন শিশু-স্বামীকে সে বাঁচায় নাই, এবং বাঘের কথা, মালিনীর কথা, এ সকল নিশ্চয়ই গল্প। কিন্তু মালঞ্চের দুঃখ সইবার শক্তি, স্নেহের জন্য তার জীবনে কষ্ট ও ত্যাগ-স্বীকার এ সকলই এক সময়ে আমাদের

দেশের স্ত্রালোকেরা নিজের জীবনে দেখিয়া গিয়েছেন। মালঞ্চের মত শত শত মেয়ে এ দেশে বিদ্যমান ছিল, যারা নীরবে সব দুঃখ সইত, এবং যাদের স্নেহ-গুণে আমাদের সমাজ সরল ও জীবন্ত হোয়ে ছিল, তাদেরই জীবনের ত্যাগের কথায়, ভক্তি, প্রেম ও এক নিষ্ঠার কথায় বেহুলা, মালঞ্চ প্রভৃতি মেয়েদের রূপ আমাদের দেশের প্রাচীন সাহিত্যে অমর হোয়ে আছে। সূর্য্যের আলো প্রতিফলিত হোলে যেরূপ হীরার শ্রী বেড়ে যায়, সাত্যিকার জগতের ছায়া প'ড়ে এই সকল গল্প-কথার শ্রী তেমনই বেড়ে গিয়েছে।

সহমরণ প্রথাটা ছিল বড় নিষ্ঠুর, সরকার বাহাদুর এটা রদ করে খুব ভালো কাজ করেছেন। কিন্তু এই সহমরণের সময় আমাদের দেশের মেয়েরা কেউ কেউ যেরূপ নিষ্ঠা দেখাতেন, তা দেখে সাহেবেরা পর্য্যন্ত অবাক্ হোয়ে গিয়েছেন। মিসার্স পোরষ্টান নামা একটি মেম একজন সতীকে দেখে বিস্ময়ে স্তব্ধ হোয়ে গিয়েছিলেন। সেই স্ত্রীলোকটি নিরুপমা

সুন্দরী ছিল এবং তাঁর ধৈর্য্য ও নিষ্ঠা দেখে মেম সাহেব বলেছিলেন, এর শরীর বলে যে একটা জিনিষ আছে এবং তা' যে সে কেয়ার করে এমন বোধ হ'ল না। আমাদের একজন ছোটলাট একটী "সতী"কে যখন নানারূপ প্রবোধ দিয়ে ফিরাতে পাল্লেন না তখন ভাব্লেন, এ যে কি ভয়ানক বিপদকে বরণ করে নিচ্ছে, তার বোধ হয় জ্ঞান নেই, আগুনের তাপ গায়ে লাগ্লেই টের পাবে এখন! এ কথা শুনে সতীর ঠোঁটে একটা ঘৃণার হাসি দেখা দিল ও পরক্ষণেই সে হাসি মিলিয়ে গেল, তারপর কিছু না বলে স্ত্রীলোকটি একজনকে একটা প্রদীপ আনতে বল্লে, এবং দীপটি একখানে রেখে নিজের আঙ্গুলটা তার শিখার উপর ধল্লে, আঙ্গুলটা একটা সরু কাঠের মত পুড়ে ছাই হোয়ে গেল, স্ত্রীলোকটি অবিচলিত ভাবে বসে রইল, যেন দীপশিখায় আর কিছু পুড়ছে, মোটেই তাতে তার কিছু আস্ছে যাচ্ছে না। লাটসাহেব দেখে অবাক্ হোয়ে গেলেন।

আমাদের দেশের মেয়েরা দৈহিক সুখ-দুঃখ

এমনই ভাবে অগ্রাহ্য করে এসেছেন বলে তোমরা বেহুলা ও মালঞ্চের মত এক নিষ্ঠার এমন সকল নিখুঁৎ ছবি দেখ্‌তে পাচ্ছ। ভিন্ন দেশেও এরূপ ত্যাগশীলা মেয়েদের দুই একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। "রাবেয়া" নাম্নী মেয়েটিব কথা অনেকেই লিখেছেন, কিন্তু আব্দুল জব্বার সাহেব এ চিত্র সম্বন্ধে যে সুন্দর ছোট বই লিখেছেন তা তোমরা প'ড়ে দেখো।

বসরা নগরে একটি স্ত্রীলোক জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাহার নাম ছিল রাবিয়া। ইহা গল্প নয় সত্যিকার কথা।

তার বাপের নাম ছিল ইসমাইল। রাবিয়ার মা তাকে ছোট্ট রেখে মারা যান। বাপের স্নেহে রাবিয়া মানুষ হোয়ে ওঠে।

কিন্তু ডাকাতের দল এসে বাপকে ধরে বেঁধে নিয়ে গেল। রাবিয়া আজ এ বাড়ী, কাল ও বাড়ী খেতেন, কিন্তু যার বাড়ীতে যেদিন খেতেন, সেদিন যদিও তারা তাঁকে দয়া করে খেতে দিতেন, তথাপি তিনি প্রাণ দিয়ে খাট্‌তেন। রাত্রি হোলে

নিজ কুটীর খানায় শুয়ে বাপের জন্য কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়্তেন।

তাঁর বাবা ডাকাতের হাত থেকে পালিয়ে মরুভূমির পথে ছুটে আস্তে লাগ্‌ল। বুড়োর তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, রোদে পা দগ্ধ হচ্ছে, বাতাস আগুণের হাল্কার মত গায়ে এসে লাগগ্‌ছে। তবু সেই ঘোর পথে একমাত্র রাবিয়াকে দেখ্‌বার আশায় ছুটে আস্‌ছে—কতদিন লাগ্‌লো সেই মরুভূমি পার হোতে।

একদিন সন্ধ্যার পর শুয়ে শুয়ে রাবিয়া বাপের জন্য কাঁদছেন, এমন সময় "মা' বলে ডেকে কে ধপাৎ করে বাড়ীর উঠানে এসে পড়্‌ল? রাবিয়া এসে দেখেন তার বাবা শুকিয়ে কাঠের মত হোয়ে গেছেন, রাবিয়া বাবা বলে কেঁদে পায়ে পড়্‌লেন। বুড় একবার মাত্র তার দিকে চেয়ে বল্ল "মা বড় তৃষ্ণা, জল।" রাবিয়া ঘটী হাতে কোরে জল আন্‌তে খানিকটা দূরে ঝরণার নিকট ছুট্‌লেন। জল এনে দেখেন, যে জল খাবে, সে দেহটি মাটীর উপর রেখে

চলে গেছে। রাবিয়া বড শোক পেলেন। এক দিকে চোখের উষ্ণজল, আর একদিকে ঠাণ্ডা ঝরণার জলে বাবাকে যেন ধূয়ে ফেল্লেন। "হায় এতদিন পরে যে তাকে দেখবে ব'লে এসেছিল, একটু জল চেয়েছিল, তাকে জল দিতে না পেরে মেরে ফেল্লুম।" এই অনুতাপে রাবিয়া দিন রাত দগ্ধ হোতে লাগ্‌লেন।

আবার খেটে খেটে এখানে ওখানে খেয়ে, সেই কুটীরটুকুতে থেকে রাবিয়া বাপের জন্য কেঁদে দিন কাটাতে লাগ্‌লেন। দস্যুরা এসে আবার সেই জায়গার অনেক লোকের সঙ্গে রাবিয়াকেও ধরে লয়ে গেল।

তারা এই ভাবে লোক জন ধরে নিত কেন জান? দাস-দাসী করে তাদেরে তারা বিক্রী করত। রাবিয়াকে তারা এক মস্ত বড় ধনী লোকের কাছে বিক্রী ক'রে ফেল্লে।

সেই ধনী ব্যক্তির বাড়ীতে ছিল লেখা পড়া জানা লোকের একটা আড্ডা, রোজ সন্ধ্যে বেলায়

সেই আড্ডায় বৈঠক হোত। কেউ ছিলেন আইনজ্ঞ, আইন কানুন নিয়ে তর্ক কর্ত্তেন; কেউ ছিলেন ডাক্তার, শবচ্ছেদ করার কথা ও নানা পীড়ার কথা আলোচনা করতেন, কেউ কবি ছিলেন নানারূপ কবিতা আওড়াতেন, আর কেউ ছিলেন গাইয়ে, গান করতেন। ধনী লোকটি ফরাসের এক ধারে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে ব'সে ব'সে তাঁদের বিচার, কবিতা, ও গান শুনতেন। রোজই খাবার তৈরী হোত, এবং তারা সকলে মিলে সেখানে খেয়ে আমোদ আহ্লাদ করতেন। রাবিয়া ও আর আর চাকর-চাকরাণীরা সেই সকল খাবার জিনিষ এনে পরিবেশন করত।

একদিন তাদের একজন একটা মাংসের হাঁড় খাচ্ছিলেন, সেই হাঁড়খানি পায়ের, তার সঙ্গে ছোট শির দিয়ে আর একখানি হাঁড় কিরূপ ভাবে জোড়া ছিল, তা দেখে তিনি সৃষ্টি-কর্ত্তার প্রশংসা করতে লাগলেন।

উপস্থিত লোকদের মধ্যে একজন বল্লেন,

"আচ্ছা মানুষের পায়ের হাঁড় কি ঠিক এই রকম ?" একজন ডাক্তার বল্লেন—"হাঁ, এই রকমের বটে, কিন্তু ঠিক এই রকম নয়। মানুষের হাট্‌বার ভঙ্গীটি ঠিক পশুর হাট্‌বার মত নয়, এজন্য তার হাঁডখানির জোড়া লাগবার ধরণটায় একটু তফাৎ আছে, কোন মানুষের পায়ের হাঁড খুল্লেই তা দেখান যেতে পারে।"

এই সময় রাবিয়া খাবার জিনিষ কিছু নিয়ে সেখানে এসে পড়্‌লেন, আর ধনী ব্যক্তিটী বল্লেন,—"তা আপনাদের সেই হাঁড পরীক্ষা করতে হোলে এই দাসীর পায়ের হাঁডখানা তুলে নিয়ে দেখ্‌তে পারেন।" ক্রীত দাস দাসীদের সে আমলে কেটে ফেলা যেতে পারত, কেউ কিছু বল্‌তে পার্‌তো না।

গৃহ-স্বামীর আদেশ মাত্র আর আর দাস দাসীরা রাবিয়াকে ধর্‌ল এবং ডাক্তার একখানি ছুরি বার করে রাবিয়ার জানুর উপরকার পেশী কেটে গ্রন্থির হাঁড়খানি বার করে ফেল্লেন। সেই হাঁডখানি দেখে

তাঁরা সৃষ্টি-কর্ত্তার কৌশলের অশেষ প্রশংসা কল্লেন। ক্রীত দাস-দাসী তো পশুর মত, রাবিয়ার উপর দয়া কোরে তাঁরা একটী কথাও বল্লেন না। তার পরে হাড়খানি আবার জোড়া দিয়ে ভাল করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে তাঁরা ছেড়ে দিলেন, আর আব লোক জন এসে তাঁকে অপর একটা ঘরে শুয়িযে রাখ্‌ল।

রাবেয়া যখন ছুরির ঘায়ে উৎকট যন্ত্রণা সহ্য কচ্ছিলেন, তখনও একটিবার কথা বলেন নাই।

সেই পণ্ডিতদের মধ্যে একজন যখন তাঁর হাঁড়-খানি দেখে বলেছিলেন 'ঈশ্বরের কি অপার কৌশল' —তখন যাঁর নাম স্মরণ করে তিনি প্রাণান্ত কষ্ট সহ্য কচ্ছিলেন, তাঁর অপার কৌশলের কথাটি তাঁর কাণে পোঁছিল; তাঁর হৃদয় বীণাটি সেই সুরে বেজে উঠ্‌লো, তিনি দেহের কষ্ট ভুলে গেলেন। যখন লোক জন তাঁকে একটি ঘরে শুয়িয়ে রেখে চলে গেল, তখন কেবলই ভগবানের দয়া মনে করে দুই চোখের জল ফেল্‌তে লাগ্‌লেন। সেই ভয়ঙ্কর নির্দ্দয়তার মধ্যে তিনি কি ভাবে ঈশ্বরের দয়ার খেলা

বেশী কোরে দেখ্‌তে পেলেন, তা ভক্ত ছাড়া কে বুঝ্‌বে ?

তিনি দিন রাত তাঁকেই ডাক্‌তে লাগ্‌লেন, এবং মনে মনে সেই ধনী ব্যক্তির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে লাগ্‌লেন। যদি তাঁর হাড মাংস কেটে তিনি এই ভাবে কষ্ট না দিতেন, তবে ত রাবেয়া এমন কোরে ঈশ্বরের শরণ নিতে পার্‌তেন না!

তিনি ভগবানকে মধুরকণ্ঠে ডেকে ডেকে বল্‌তেন, "যদি আমার সমস্ত দেহ খণ্ড খণ্ড কোরে কাট্‌লে কেউ একটু খুসী হ'ন—তবে এই সমস্ত বাড়াটা আমার রক্ত-ধারায় লাল হোয়ে যা'ক্ না। তাতেই আমার সুখ। প্রভু, তুমি যদি একবার মাত্র আমার প্রতি অনুগ্রহ কোরে এই হৃদয়ে এস, তবে এখানে সমস্ত বসন্তকালের উৎসব আরম্ভ হবে। পদ্মটাকে ছিঁড়ে ফেল্লেও সে সূর্য্যের দিকে চেয়ে চেয়ে হাসে, তুমি সমস্ত ব্যথা দিয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়াও আমি তোমার মুখ দেখে তেমন্‌ই সব ভুলে যেয়ে হাস্‌বো। আমার যদি দুঃখ থাকে, তবে

থাকুক না, পর্ব্বতের মধ্যে অগ্নিকুণ্ড থাক্‌লেও তার লতা পাতা ফুল-পুষ্প নিয়ে কি হাসে না? তোমার করুণা পেলে আমার সে হাসি বন্ধ কর্‌বে কে? এই সংসারে কত দুঃখ, সেই বোঝা আমার মাথায় দাও, সেই দুঃখের বোঝা আমি তোমার করুণা স্মরণ করে আনন্দে বইব—তুমি জগতের কষ্ট দূর কর।"

একদিন গৃহস্বামী দাসীর ঘর হোতে এক অতি মিষ্ট সুরে প্রার্থনা শুনে দাঁড়ালেন, তখন রাত অনেক হয়েছে। তিনি কাছে যেয়ে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে যা শুনলেন,—যা' দেখলেন, তাতে তাঁর চক্ষু হোতে দর দর অশ্রু পড়্‌তে লাগ্‌লো।

দেখ্‌লেন রাবিয়া জানু পেতে বসে হাত জোর করে ভগবানকে ডেকে বল্‌ছেন,—"প্রভু, আমায় বড কোরো না। আমি পর্ব্বত হোতে চাই না, আমায় মাটী ক'রে রাখ, সববাএর পা যেন আমার বুকের উপর পড়ে, ক্ষুধিত এলে যেন আমাতে খাদ্য পায়। আমি লবণ সমুদ্রের মত এত বড হোতে চাই নে,

প্রভু আমায় ছোট্ট একটি ঝরণা করে রেখ যে তৃষ্ণার্ত্ত তার যেন তৃষ্ণা মিটাতে পারে, সব্বাই যেন আমার জলে পা ধুতে পারে। আমাকে বিশ্বজয়ী বীরের তরবারী খানির মত কোর না ; আমায় এক-খানি লাঠি করে রাখ, যে চলতে না পারে সে যেন আমাকে অবলম্বন করে চলতে পারে।" রাবিয়ার দুই চোখ হোতে জল পড়ছিল, তিনি আবার বলছিলেন—"আমার এই বাড়ীর প্রভুকে ভাল রেখ, তার প্রসাদে আমি খেয়ে পরে সুখী আছি। আমি যে যন্ত্রণা পেয়েছি, তার মধ্য দিয়ে তোমাকেই চিনতে পেরেছি,—এইজন্য ধন্যবাদ।"

এর পরে তিনি সেই বাড়ীর সকলের জন্য এবং সর্ব্বশেষ জগতের মঙ্গলের জন্য ভগবানের নিকট বারংবার প্রার্থনা জানালেন, তখনও তার চোখের জল পড়ছিল।

গৃহস্বামীর মনে যে কি হতেছিল তা আর কি বলব? যাকে তিনি পশুর মত কষ্ট দিয়েছেন, সে তাঁর জন্য ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করছে ও

কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে। রাবিয়া তো মানুষ নহে—সে স্বর্গের দেবী।

তিনি রাবিয়াকে মুক্তি দিলেন। রাবিয়ার নাম দেশময় রাষ্ট্র হয়ে গেল। এক প্রধান ফকির বলেছিলেন—"কোনও রূপ শিক্ষা না পেয়ে রাবিয়া আশ্চর্য্য বিশ্বাস বলে ধর্ম্মের সব গূঢ়তত্ত্ব বুঝেছেন।"

আজ গায় হলুদের দিনে তোমায় বল্‌তে এসেছি, সংসারের দুঃখ কষ্ট মাথায় করে নিয়ে তুমিও স্বর্গের দেবী হোতে পার। এই মানব-জন্মই ত সাধনার স্থল —এটা যা' মনে আস্‌বে তাই কর্‌বার জায়গা নয়।

সীতা-সাবিত্রী—চিরদুঃখী

তুমি সীতার কথা শুনেছ, তাঁর মত হোতে কোন্ মেয়ের সাধ না যায়? সতী-সাবিত্রীকে তুমি ঘুম ভাঙ্গলে রোজ প্রণাম কোরে উঠ। তাদের মত হো'য়, এই আশীর্ব্বাদ তো তুমি বরাবর শুনে আস্‌চ। কিন্তু তারা জীবনে কি খুব সুখী হোয়েছিলেন? সীতাকে তো একরূপ আজন্ম

দুঃখী বলা যেতে পারে, সাবিত্রীও ত বনে বনে স্বামীর সঙ্গে ঘুরে কত কষ্ট পেতেন। সত্যবান যে কাঠ কেটে দিতেন, সাবিত্রী তা কুড়িয়ে ঘরে তুলে রাখ্‌তেন। এই দুই রাজার ঘরের বউ এরইত কত রকম দুর্দ্দশা, তবু তোমার গুরুজন এদেরই মত হোতে বলেন কেন? কেন নুরজাহান কি রিজিয়ার মত হোতে বলেন না? কত শত ভাগ্যবতী মেয়ে তো রাণী হোয়ে মাথায় সোণার মুকুট পরে এই ভারতবর্ষে কত প্রতাপ কত ঐহিক সম্পদ্ দেখিয়ে গিয়েছেন। তাঁরা জীবনটা আদরে আদরে কাটিয়ে গিয়েছেন, তাঁদের হুকুমে রাত দিন হোয়ে গেছে, তাজমহল উঠেছে, যেখানে জমি ছিল সেখানে নদী বয়ে গেছে, নদী ভরাট হোয়ে ডাঙ্গা হোয়েছে, এমনি ছিল তাদের প্রতাপ। হেলেনা ও ক্লিওপেট্রার মত সুন্দরী কে? কিন্তু এসকল ভাগ্যবতী জগৎ ভরে থাকা সত্ত্বেও যারা রাজ্য হারিয়ে বনে বনে ঘুরেছে, তেতো বন ফল খেয়ে বেড়িয়েছে, পায়ে কাঁটা

বিধেঁছে, যাদের কোন দিন উপোস করতে হোয়েছে, কোন দিন আধপেটা খেয়ে থাকতে হোয়েছে, কত রাত গাছের তলায় ঘাসের উপর আঁচল পেতে শুয়ে কাটাতে হোয়েছে, তার উপর আবার কাক স্বামীকে যমে ধরে টানাটানি করেছে, কাকে বা রাক্ষসে ধরে নিয়ে গিয়েছে, এই সকল চিরদুঃখী মেয়েদেরে আমরা এত ভাল বাসছি কেন? তোমাদেরে আশীর্ব্বাদ করবার সময় এদের মত হবার কামনা করি কেন?

এতেই বুঝতে পেরেছ আমাদের দেশ প্রকৃত পক্ষে বাইরের সম্পদ্ চায় না, তুমি সাংসারিক জীবনে সুখে থাক কি দুঃখে থাক—এর দরুণ আমাদের ততটা ভাবনা চিন্তার কারণ নেই। তোমাকে ভগবান কতকগুলি মূল্যবান জিনিষ দিয়ে পাঠিয়েছেন,—সেগুলি হোচ্ছে, প্রেম, নিষ্ঠা, দয়া, ত্যাগ প্রভৃতি সদ্গুণ, এই গুণগুলি তুমি বুকের ধন কোরে রাখতে পেরেছ কিনা তাই দেখবে। কেউ যদি তোমার হাতে একখানি হীরা দিয়ে

কোথায়ও পাঠিয়ে দেয়, আর তুমি যদি তা পথে যেতে ভুলে হারিয়ে ফেল, অথচ রাস্তায় সোণার ময়ূরপংখী ডিঙ্গিতে শুয়ে আরাম করতে করতে যাও, তা' হোলে লোকে তোমায় অপদার্থ বলবে কি না, বল ? আর যদি কেউ সেই হীরে খানি বুকে করে পথে চলে, কাঁটার আঁচরে পা' ছিঁড়ে যাচ্ছে, রোদে মাথা ফেটে যাচ্ছে, পথে ডাকাতের হাতে পড়েছে, তবুও যদি সে হীরে খানি নিয়ে যথাস্থানে পৌঁছিয়ে দেয়, তবে তাকে সবাই প্রশংসা করে কিনা ? ভগবান তোমার অন্তঃকরণে যে সকল গুণ দিয়েছেন, শত শত বিপদে প'ড়ে, প্রলোভনে প'ড়েও যদি তা রাখতে পার, তবেই মনুষ্য জীবনের সার্থকতা হো'ল। তা না হোলে কে ঘি দিয়ে ভাত খেয়েছে, কে শুধু নূন মাখিয়ে খেয়েছে, কে হেঁটে পথে চলেছে, কে মোটরে গিয়েছে, এসকল অতি ছোট কথা। এদেশের লোক ধন দৌলত নিয়ে বড়াই করে নাই, হৃদয় নিয়ে বড়াই করেছে। তাই চিরদুঃখী কৌশল্যা,

চিরদুঃখী বেহুলা, চিরদুঃখী সীতা, এরাই হচ্ছেন—হিন্দুর ঘরের দেবী ; সূয়ো রাণীর উপর কারু শ্রদ্ধা নেই, দুয়ো রাণীর কুড়ে ঘরখানিকেই আমরা ভক্তি করে থাকি।

বেসন্তরার গল্প

তোমরা শুনেছ, বাল্মীকি বহুপ্রাচীন কালে রামায়ণ রচনা করেছিলেন। খুব সম্ভব বাল্মীকিরও অনেক পূর্ব্বে বেসন্তরা নামক এক রাজকুমারের কথা কোন কবি লিখেছিলেন। সেই কাব্যে দেখা যায় প্রজারা জুটে জোর করে যুবরাজ বেসন্তরাকে বনে পাঠাল। তাঁর কোন দোষ ছিল না। তাঁর একটী শ্বেত হস্তী ছিল, সেই হস্তীর গায়ে কোটী কোটী টাকার আসবাব ছিল, তার হাওদা, তার গালিচা, তার মাথার মালা ও মুকুট, তার লেজের গয়না এ-সকলের মাঝে হীরার

ছড়াছড়ি ছিল। লোকের বিশ্বাস ছিল এই হাতী বড় সুলক্ষণ, এর গতিকে রাজ্যে কোন বিপদ্ আস্‌তে পারে না। কিন্তু বেসন্তরা ছিলেন ভারী একজন দাতা। তার নিয়ম ছিল, পূর্ণিমার দিন যদি কোন বামুন তার কাছে কিছু চাইবে, তবে তিনি সেটি না দিয়ে জল গ্রহণ কর্‌বেন না, তা হোক না কেন তাঁর সর্ব্বস্ব। ভিন্ন দেশী কয়েকটি বামুন জুটে পূর্ণিমার দিন যেয়ে বেসন্তরার কাছে শ্বেত হস্তীটি দান চাইলে; যুবরাজ সমস্ত আসবাব সমেৎ সেই হস্তীটি তাদের দিয়ে দিলেন।

এখন প্রজারা এই খবর পেয়ে শ্বেত হস্তীটির জন্য অনেক দুঃখ কর্‌লো। তারা বুড় রাজা সঞ্জয়কে যেয়ে বল্লে, যুবরাজ আমাদের দেশের সাক্ষাৎ মঙ্গল-স্বরূপ শ্বেত হাতীটি দিয়ে ফেলেছেন, এ ভারি অন্যায় করেছেন, আমরা যেয়ে তাঁকে বল্লুম, 'এ কি করেছেন!' তার উত্তর হো'ল 'হাতী তো হাতী, তারা আমার প্রাণ চেলে প্রাণ দিতুম।'

আমরা যেয়ে তাঁকে বধ কর্‌ব বলে ভয় দেখালুম,

তিনি তাতে ভয় না পেয়ে বল্লেন, "আমার জিনিষ আমি দিয়েছি, এই অপরাধে যদি তোমরা আমায় মারতে চাও, মারতে পার।" এই বলে বুড় রাজাকে তারা শাসিয়ে বলতে লাগলে, 'এখন মহারাজ যদি যুবরাজকে বনবাস না দেন, তবে আমরা সবাই মিলে আপনার বিরুদ্ধে দাঁড়াব।' বুড় রাজা এই অবস্থার চক্রে পড়ে নির্দোষ বেসন্তরার উপর বনবাস দণ্ড দিতে বাধ্য হোলেন।

বেসন্তরা বনে যাওয়ার পূর্ব্বে তাঁর স্ত্রী মাদ্দিকে ডেকে বল্লেন, 'তোমাকে আমি যা কিছু হীরে জহরৎ মূল্যবান উপহার দিয়েছি, তোমার বাবা যা কিছু বহুমূল্যবান যৌতুক দিয়েছেন, তা ভাল করে লুকিয়ে রাখ।'

মাদ্দি বল্লেন, 'আমি সেগুলি ভাল করে লুকিয়ে রাখবার জায়গা কোথায় পাব?' বেসন্তরা উত্তরে কইলেন, 'যারা দীন, দুঃখী, তাদের হাতে দাও, তোমার ধন নিরাপদে রাখবার এর চাইতে ভাল জায়গা হোতে পারে না।'

তার পর তিনি স্ত্রীকে সংসারে কি ভাবে চল্‌তে হবে তার সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিলেন।

মাদ্দি চম্‌কে উঠে বল্লেন, "আজ এসব কথা কেন বল্‌ছেন?" বেসন্তরা স্থির ভাবে বল্লেন— 'আমাকে দেশের লোকেরা নির্ব্বাসন দিতে স্থির করেছেন, আমায় একা বনবাস যেতে হবে।"

মাদ্দি এই কথা শুনে উত্তেজিত স্বরে বল্লেন— "প্রভু, এ হোতেই পারে না, প্রজারা তোমাকে বনবাস দিলে আমায়ও দিয়েছে; আমায় একা তোমার কাছ ছেড়ে থাক্‌তে বল, নতুবা আগুণে ঢুকে মর্‌তে বল, আমি আগুণে পড়েই মর্‌ব, তোমার কাছ ছাড়া হোয়ে থাক্‌তে পার্‌ব না। বনে দেখ্‌তে পাও না, হাতীর সঙ্গে হাতীনি যায়, ময়ূরের সঙ্গে ময়ূরী ঘুরে বেড়ায়, আমি সেইরূপ তোমার সঙ্গে বেড়াব। আমার ছেলেদের নিয়ে আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাক্‌বো। আমায় মানা কোরো না।"

তার পর মাদ্দি হিমালয়ের কথা বল্‌তে লাগ্‌লেন,

"সেইখানেই তো বনবাস হবে—ছেলেদের হাসি, এলো মেলো কথা ও কৌতুক বনের মধ্যে আমাদের ভুলিয়ে রাখ্‌বে, তখন তুমি ভুলে যাবে যে তুমি এত বড় রাজ্যের রাজা ছিলে।

"তারা যখন ফুল সাজে সেজে বন ফুলের মুকুট পরে হাস্‌তে হাস্‌তে জড়িয়ে ধর্‌বে, তখন তুমি কুঁড়ে ঘরে থেকেও ভুলে যাবে যে এত বড রাজ্যের রাজা ছিলে।

"যখন তারা বনের মধ্যে খেল্‌তে থাক্‌বে এবং নিজেরা ছোট ছোট ফুলের চারা এনে কুঁড়ে ঘরের পাশে উঠোনের এক কোণে বুন্‌বে, তখন তাদের মুখ দেখে ভুলে যাবে—যে তুমি এত বড় রাজ্যের রাজা ছিলে!

"যখন বড় বড় হাতী ও মোষগুলি স্বচ্ছন্দে ঘোর বনে ঘুর্‌তে থাক্‌বে, তখন তাদের প্রকাণ্ড শরীর দেখে বিস্ময়ে ভুলে যাবে—তুমি এত বড় রাজ্যের রাজা ছিলে!

"যখন সেই ঘোর বনে হরিণ আশ্চর্য্য হোয়ে

আমাদের মুখের দিকে চাইবে, ঝরণার ধারে বেঙগুলি লাফিয়ে লাফিয়ে নাচ্‌বে, তখন তুমি ভুলে যাবে তুমি এত বড রাজ্যের রাজা ছিলে !

"যখন মেঘ দেখে ময়ূরী নাচ্‌বে, আকাশে ইন্দ্রধনু উঠ্‌বে, গণ্ডারগুলি বড বড ছবির মত বনের এক কোণে দাঁড়ায়ে দুল্‌তে থাক্‌বে, যখন কোটর হতে পেঁচা গগা সুরে ডেকে কালোয়াতের গলাকে যেন ঠাট্টা কর্‌তে থাক্‌বে, যখন ঘোর অরণ্য শীতের শেষে নূতন পাতা পরে—সবুজ হয়ে উঠ্‌বে, গাছে গাছে ফুলের বাহার হবে, পদ্ম তার দল-গুলি মেলে সূর্য্যের কাছে যেন তার প্রাণের ভালবাসা খুলে ধর্‌বে—তখন তুমি নিশ্চয়ই ভুলে যাবে, যে তুমি এত বড় রাজ্যের রাজা ছিলে !"

স্ত্রী কেবল যে তার স্বামীর সঙ্গে যেতে চাচ্ছেন এমন নয়, তিনি তাকে আনন্দ দেবার মতন মনটির আভাস দিচ্ছেন ; সেই ঘোর অরণ্যে নির্ব্বাসন দণ্ড সত্ত্বেও স্ত্রী কাছে থাক্‌লে তাঁর কোন দুঃখের হবে না, বরং রাজ-সিংহাসন হোতে

সেই আরণ্যজীবন বেশী সুখের হবে—তা' দেখাচ্ছেন। তিনি স্বামীর দুঃখের বোঝা বাড়াবেন না, তাঁকে আনন্দ দেবেন, তাঁর সঙ্গে থেকে সেই আনন্দ উপভোগ কর্‌বেন—এইজন্য তিনি যেতে চাচ্ছেন। এখানে তাঁর ভালবাসা কঠোর ভাবে দেখা দেয় নাই, অতি সহজ আনন্দের মধ্যে সুন্দর হোয়ে দেখা দিয়েছে। বাল্মীকি হয়ত এই সকল কথা হোতে সীতার উক্তিগুলি অনেক নিয়েছেন, কিন্তু তা' এখানে বল্‌বার দরকার নাই।

ভালবাসার—দেওয়া নেওয়ার হিসাব নয়

সুতরাং দেখ্‌তে পাচ্ছ, পার্থিব সুখ দুঃখটা কোন কালেই আমাদের মেয়েরা গণ্য করেন নাই। অথচ তুমি এটি যেন মনে না কর যে, এই সকল মেয়েরা বড় কাঠ খোট্টা। এরা আগুণে পড়ে মর্‌তে জানে, এরা স্বামীর সঙ্গে যমের দোর পর্য্যন্ত যেতে জানে, এরা শ্বশুর শাশুড়ীর অত্যাচার অবিচার পাষাণে বুক বেঁধে সইতে জানে, কিন্তু

এদের ভিতরে আকর্ষণী শক্তি কোথায়? এদের মধ্যে কোমলতা যেন বড় চাপা পড়ে গেছে, এরা আমোদ আহ্লাদ দিয়ে গডা নয়, দুঃখ দিয়ে গড়া।

কিন্তু আমি বল্‌বো আমি দুঃখের গড়নকে বড ভালবাসি। এদের মধ্যে যে কোমলতা নেই, তা কে বল্লে? তুমি কি বল্‌তে চাও, মা ছেলের জন্য এত কষ্ট সহ্য করেন ব'লে তার মনে আমোদ আহ্লাদ নেই? তুমি তো শুনেছ গভীর জল সহজে নডে না, ছোট একটী ঝরণা লাফিয়ে লাফিয়ে চলে,—গভীর শান্ত বড় পুকুরটী কেমন স্তব্ধ স্থির।

যে গভীরভাবে ভালবাস্‌তে জানে, তার আনন্দ প্রাণের ভিতর, তা সহজে সে দেখ্‌তে দেয় না। দুঃখের কয়লার খনির মধ্যে ত্যাগের কঠোরতার মধ্যে সেই আনন্দের হীরা লুকিয়ে থাকে। মা যখন ঘুমন্ত ছেলেটিকে হাস্‌তে দেখেন, ঝাঁপিয়ে কোলে আসবার সময় তার মুখের আধবোল শুন্‌তে থাকেন, তখন তার সমস্ত পরিশ্রম শোধ হয়ে যায়, শত কষ্টের

পুরস্কার হাতে হাতে পান। স্নেহ দেওয়ার মধ্যেই তো পারিশ্রমিক লুকিয়ে থাকে, বাইরে তা পাবার লোভে যে হাত বাড়ায়, সে হতভাগা তো কিছুই পেল না।

তরল আমাদের লোভে সেই গভীর আনন্দ হোতে বঞ্চিত করে মনকে পথের ভিখারী করো না। যার তার কাছে, সময় নাই অসময় নাই, হাত পেতে কড়া ক্রান্তি আদায় কর্‌বার চেষ্টা করো না,—তা হো'লে তুমি যে ভিখারী সেই ভিখারীই থেকে যাবে।

তুমি যার জন্য সে টুকু কর্‌বে, তার দেনা-পাওনার হিসাব সেইখানেই চুকে যা'ক্। অর্থাৎ তুমি সেবা দিবে—হৃদয়ের ঘড়া একেবারে খালি করে স্নেহের সুধা ঢেলে দিবে, কিন্তু প্রতিদানে কিছু চাইবে না। পাওয়ার প্রত্যাশাও করো না, তা হো'লেই তো তুমি দাতা হতে পার্‌বে। নৈলে তুমি এক হাতে দিয়ে যদি দাম চেয়ে আর এক হাত পাত, তবে তো তুমি একটা বাজারের বেনে হো'লে। দেওয়ার মত দিতে পার্‌লে, তুমি ত তখনই

তার পুরস্কার পাবে, অর্থাৎ আনন্দ তোমার চোখের কোণে এসে চোখ জলে ভরে দিবে—তার চেয়ে বড় পুরস্কার আবার কোথায় পাবে? যাকে তুমি স্নেহ মমতা দিয়ে সেবা করে সুখী কর্ত্তে চেয়েছ, তাকে তুমি আরও কি দিতে পার—হৃদয় ভাণ্ডার খুলে আর ও কি দিতে পারি—তাই দেখ, সঙ্গে সঙ্গে পুরস্কার। এই নিঃস্বার্থ স্নেহ যত দিবে, ততই তার ভাণ্ডার বেড়ে যাবে। তুমি কল্পতরু হোয়ে সংসারের ইষ্ট কর্‌বার জন্য তোমার নিজের সব খানি বিলিয়ে দিয়ে দে'খো, সে কি আনন্দ! যে দিয়ে আবার এক চোখে চেয়ে দেখে, কতটা পেল,—সেই হতভাগা চিরজীবনটা কেঁদে কেঁদে কাটায়। কে কি তোমায় দেয় নাই, হিসাব-নিকাশের সময় সে কথা উঠ্‌বে না। তুমি কি দেও নাই, তার জন্য তোমাকে জবাবদাহী হোতে হবে, জে'ন।

এখন বুঝ্‌লে সংসারে তোমায় কি ভাবে চল্‌তে হবে। ভাল পথে চলা সহজ হো'তে সহজ,—যত বড় ত্যাগই কেন না হয়, তুমি যদি এই বয়স

হোতে তার দীক্ষা নেও,—তা কর্ত্তে তবে তোমার কোন কষ্টই হবে না। ফুলটি যে ঝড় বৃষ্টি মাথায় কোরে নিয়ে কেবলই হাস্‌তে থাকে, তা কি সে খুব কষ্ট করে হাসে? গাছটি যে তার শত্রুকে ফুল ফল বিলিয়ে দেয় অর্থাৎ যে তার গোড়া কাট্‌ছে, তার হাতেও ফুল ফল পড়্‌ছে,—তা কি সে কষ্ট করে দেয়? তার স্বভাবটি এমনই হো'য়ে গেছে যে সে সেরূপ না করে থাক্‌তে পারে না। তুমিও যদি এখন থেকে ভাল হ'ব, এই প্রতিজ্ঞা ক'রে বস, তবে দেখ্‌বে ভাল হওয়া একেবারেই কষ্টকর নয়। মনটাকে মাঝে মাঝে ঘাড় নাড়া দিয়ে ঠিক সোজা পথে রাখ্‌বে—কতদিন পরে দেখ্‌তে পাবে ভাল পথে চলা কত সহজ! কিন্তু যদি তোমার অভ্যাসগুলি খারাপ হোয়ে পেকে যায়, শেষে শোধ্‌রাতে গেলে ভাঙ্গবে, তবু নোয়াবে না।

মেয়েদের কর্ত্তব্য

আগেকার দিনে কতকগুলি কর্ত্তব্য ছিল, এখনকার কাজ হয়ত ঠিক সেরূপ নয়, কিন্তু আমার

তা' সব খুটিনাটি করে বলবার দরকার নাই। স্ত্রী-পুরুষ মিলে মিশে সর্ব্বদা সব জায়গায় সংসার চালিয়ে থাকে, কেউ বসে থাক্‌তে আসেনি। এই দু'য়ের মধ্যে যদি কেউ কাজ করে এবং কেউ ঘুমোয় —তবে সংসার চল্‌বে না। সে জাতি মরে যাবে।

এক সময় ঋষিরা বেদের গান রচনা কর্ত্তেন— তাদের মেয়েরা হোমের আগুণ জ্বালিয়ে রাখ্‌তেন। তার পরে পুরুষেরা এবং মেয়েরা একত্র হোয়ে সংসারের কাজ দেখ্‌তেন। পুরুষেরা যজ্ঞ কর্‌তেন, মেয়েরা পৈতা কাট্‌তেন। পুরুষেরা তাঁত বুন্‌তেন মেয়েরা চরকা কেটে সূতো তৈরী কর্‌তেন। পুরুষ দেশ দেশান্তর হ'তে অর্থ আন্‌তেন, মেয়েরা সাঁঝের দীপ জ্বেলে সে গুলি বরণ করে তুল্‌তেন। পুরুষেরা বাইরের সমস্ত কাজ করে যখন বাড়ীতে ফির্ত্তেন,— তখন দেখ্‌তেন ঘরের কাজ সমস্ত হোয়ে আছে। তোমরা মনে কর্‌ছ, যা কিছু সন্দেশ মেঠাই, সে সকলের উৎপত্তি-স্থান বাজার। ওগো তা নয়। খাবার সমস্ত জিনিষ আগে ঘরে তৈরী হোয়েছে,

তবে বাইরে গেছে। মেয়েরা তাদের স্বামী, পুত্র, অভ্যাগত সকলের জন্য ভেবে ভেবে নানা রকমের খাবার স্থষ্টি করেছেন, সে গুলি মা' বোন ও স্ত্রীর স্নেহের দান। তা এখনকার মেয়েরা ভুলে গেছেন। তোমরা যদি পুরাণো বাঙ্গলা বই পড়, তবে দেখ্‌বে শাক সবজী দিয়ে, গুড নার্‌কেল দিয়ে, দুধ ও চিনি দিয়ে আমাদের দেশের মেয়েরা আগে কতরকমের জিনিষ স্থষ্টি কর্ত্তেন! কত খানি স্নেহের রাজ্যে সেই সকল খাদ্যের জন্ম হো'ত, তা যদি তোমরা জানতে? কই এ আমলে ত ঘরের বউ কোন একটা নূতন খাদ্যের স্থষ্টি কর্ত্তে পাল্লেন না। তাঁরা ধীরে ধীরে ঘর হোতে বাইরে সরে পচ্ছেন। লক্ষ্মীটি তুমি তা করো না, ঘরের শ্রী বজায় রেখো, ঘরের উন্নতি করো।

তুমি শুয়ে শুয়ে গল্পের বই পড়্‌লে সংসার চলবে না। পুরুষেরা যেদিকে যাবেন, তোমাদের তাদের সঙ্গে সঙ্গে যেতে হবে—তা না হোলে তারা বল পাবেন কোথেকে? আজ দেশের যে অবস্থা, তাতে

দরিদ্রের দুঃখ শুনে যখন তাঁরা অন্নবিতরণের জন্য ছুট্‌বেন, তখন তাঁদের হাত ধরে আট্‌কে রেখো না, তোমরা বল দিও, তোমাদের বল পেলে যারা মেষের মত দুর্ব্বল তারা সিংহের মত হোয়ে উঠ্‌বে। তোমরা ঘরে বসে দুঃখীর জন্য এক ফোঁটা চোখের জল ফেল, তা হ'লে দেখ্‌বে বাড়ীর ছেলেরা ঝড় তুফান না মেনে দুঃখীর বোঝা মাথায় পেতে নেবে, ভাই বলে কেঁদে তার হাত দুটি ধর্‌বে। তুমি গহনার জন্য কান্নাকাটি করে, বৃথা আমোদের জন্য টাকা চেয়ে চেয়ে পুরুষের উত্তম চেপে রেখো না। তোমার চোখের সেই ইঙ্গিত দাও—যাতে করে পুরুষ দশের ভার মাথায় নিতে পার্‌বে,—যেমন বিদ্যুতের একটা ইঙ্গিত যখন আকাশে চম্‌কে ওঠে, তখন সেই ইঙ্গিত সমস্ত মেঘের জলকে পৃথিবীর তাপ নিবারণের জন্য পাঠিয়ে দেয়। তোমার একটি কথায় যে কাজ হবে, সুরেন্দ্রবাবুর বক্তৃতায় ত' হবে না, রবিবাবুর লেখা পড়ে তা হবে না।

আজ জে'ন, তুমি আমোদের জন্য যাচ্ছ না। তুমি

যেখানে যাচ্ছ সেখানে থেকে দশের উপকারের কাজ স্থুরু হবে। তুমি অবলা নও, তোমার বলই গৃহস্থের সম্বল। তুমি যে সংসার ভালবাস্‌বে, সে সংসার হিমালয়ের মত হয়ে দাঁড়াবে। তোমার সোণার বালার একটু খানি দীপ্তিতে সেই সংসার উজ্জ্বল হোয়ে উঠ্‌বে। পুরুষেরা তোমার চোখের জল, তোমার হাসি, তোমার মুখের কথায় গা' ঝাড়া দিয়ে উঠে কাজে লেগে যাবে। আর তুমি যদি সংসারটি ভালবাসার চোখে না দেখ্‌লে, তবে সে হতভাগা সংসারটা মরুভূমি হয়ে যাবে। গণেশের মত লেখকের লিখ্‌তে হাত কাঁপবে—বৃহস্পতির মত বুদ্ধিমান সামান্য হেয়ালীর অর্থ কর্‌তে ঘেমে যাবেন, ও ভীষ্মের মত সাধুচরিত্র লোক আড্ডায় প'ড়ে গড়াগড়ি যাবেন। পৃথিবী যেমন ভিতরে ভিতরে কাজ করেন,—ফুলের মধ্যে নানা রং লিখে দিচ্ছেন, গন্ধ ও মধুতে তার বুক ভরে দিচ্ছেন, শালগাছের সার তৈরী কচ্ছেন, লতাকে কোমলতা দিচ্ছেন,—কিন্তু কেউ তো তাঁকে কাজ কর্‌তে দেখ্‌ছে না, সব্বায়ের

চোখের আড়ালে তিনি কাজ কচ্ছেন,—তোমাদের কাজটা অনেকটা সেই ভাবের। তোমাদের সেই অজানা ভেতরকার শক্তি,—মানুষগুলিকে গড়ে তুলছে। কেবল মাতৃগর্ভে নয়,—পৃথিবীতে এসেও মানুষ তার বুকের রক্ত ও দেহের বল সবই তোমাদের কাছে থেকে পাচ্ছে, কেউ তা দেখ্‌ছে না, কিন্তু তা নিশ্চয়ই কাজ কচ্ছে।

ওগো লাল চেলী-পরা বিয়ের কনেটি, একবার জোড় হাত কোরে ভগবানকে ডেকে যাও। চলেছ মস্ত বড় প্রকাণ্ড রাস্তায়—সে রাস্তাটা যেন তোমার কাছে অলি গলির মত ছোট না হোয়ে যায়। তুমি সব জিনিষকে বড় করে দে'খ—তা'হলে সেই বাড়ীর সকলে সেইভাবে দেখ্‌বেন। এমন কথা বলো না, যা তোমার যোগ্য নয়, যাতে মানুষের মনে কষ্ট হোতে পারে। এমন কাজ ক'রো না, যার জন্য শেষে অনুতাপ হ'তে পারে। নিজকে একা কত দিক্ দিয়ে রক্ষা করবে? তা হোলে ত তোমার সামর্থ্যে কুলোবে না। তাই বল্‌ছি, তাঁকে ডাক, যিনি তোমায়

সাম্‌লিয়ে নেবেন ; তোমায় তাঁর রাজ পথে নিয়ে যাবেন, পাপ-তাপ দূরে রেখে, তুমি ছোট্টটি হলেও, তাঁর অসীম দয়ায় তোমাকে হাত ধ'রে নিয়ে যাবেন। তুমি তাঁর স্নেহের দীপটি জ্বেলে তা' দেখ্‌তে দেখ্‌তে—লাল চেলীখানা পরে শুদ্ধ-মনে যাও, দেখ্‌ছ না তোমার মাথায় তোমার মায়ের আশীর্ব্বাদী ধান দুর্ব্বা রয়েছে—ভয় কি ?

পরিশিষ্ট

তুমি প্রথম শ্বশুর বাড়ী চল্লে,—তাঁরা তোমার ব্যবহার দেখে যেন বেশ খুসী হো'লেন। তুমি বালিকা বিদ্যালয়ে না হয় প'ড়ে এসেছ, প্রাইজ পেয়েছ; মেডেল ও বইগুলি দেখে তাঁরা তোমার খুব প্রশংসা করলেন। তুমি হয়ত শেলাইএর কলে বেশ শেলাইটি শিখে এসেছ, তোমার হাতের কাজ তো পাকা-দেখ্‌বার আগেই তাঁরা দেখেছিলেন। কিন্তু তা ছাড়াও ত কিছু চাই। তাঁদের একটু মিষ্টি মুখ ক'রে খুসী করতে পারলে তাঁদের যত আনন্দ হবে, তার চাইতে তোমার ঢের বেশি আনন্দ হবে। বাজারে সব জিনিষই পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু নূতন বউএর হাতের তৈরী জিনিষের সঙ্গে কি বাজা'রে জিনিষের তুলনা হয়? কিসে আর কিসে?

আমি আজ তোমায় কয়েকটি জিনিষ তৈরী করতে শিখিয়ে দিচ্ছি। আমার বাড়ী ছিল ঢাকার জেলায়, সেইখানের লোকেরা যা তৈরী করতে পারেন, তেমন কয়েকটি জিনিষের কথা এখানে বল্‌ব।

গায়ে হলুদ

"ঢাকাই অমৃত্তির" কথা তোমরা শোন নি? সেইটি দিয়ে সুরু করব। বেশী জিনিষের কথা বলে তোমার মাথা আজ ঘুলিয়ে দেব না। নূতন রান্না শিখবে— আবার কালীঝুল মেখে চাঁদমুখখানি ম্লান করবে, কি হয়ত চেলীর পাড়ে আগুণ লেগে উঠে কি সর্ব্বনাশ ঘটতে পারে, এইজন্য আজ সামান্য কয়েকটি পদ তোমায় শিখিয়ে দেব। তুমি খুব সাবধানে উনুনের ধারে বসবে, আগুন থেকে একটু তফাৎ থাকবে এবং শাড়ীর আঁচলের দিকে নজর রাখবে। আর এমন সকল বউ আছেন—আমি দেখেছি, যাঁরা রান্নাঘর থেকে ঠিক দুর্গাপ্রতিমার মত বার হ'ন, রং যেন আরও ফুটে উঠে, কাপড়ে একটি কালীর রেখ নেই। তুমি যে কাজ করবে তা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে করবে। রান্না ঘরে খাবার জিনিষ থাকে, সুতরাং সেখানটা যতটা পার পরিষ্কার রাখবে সকল জিনিষ যাতে ঢাকা থাকে—বেড়ালে মুখ না দিতে পারে, পোকা, ধূলো কি আর কিছু না পড়তে পারে—সেই দিকে লক্ষ্য রাখবে।

"ঢাকাই অমৃতি"

একসের কলাই দাইল তিন সের জলে ভিজিয়ে রাখ। সন্ধ্যায় ভিজিয়ে রেখে পরের দিন সকালে দাইল ধুয়ে জলটা ফেলে দাও। একসের দাইল ভিজে গিয়ে দেড় সেরে দাঁড়াবে। তার পর শিলের উপর সেই দাইল খুব ভাল ক'রে বেটে ফেল। সেই বাটা দাইল ফেনিয়ে মাখনের মত কর, এবং একপোয়া এরারুটের সঙ্গে মিশিয়ে ফেল।

এই মেশানো জিনিষটার আধপো আন্দাজ একটা সাফ্ ন্যাকড়ার ভেতর পুরে নীচের দিকে একটা ফুটো কর।

এদিকে একখানি তাওয়ায় বা কড়ায়ে পাঁচপো ঘি রেখে উনুনের উপর জ্বাল দাও। ঘি গরম হোলে অর্থাৎ যখন তা থেকে ধোঁয়া উঠ্‌তে থাক্‌বে, তখন সেই এরারুট মেশানো দাইল শুদ্ধ ন্যাকড়ার পুঁটলীটা তার উপরে শক্ত ক'রে ধরে আস্তে আস্তে টিপ্‌তে থাক। তা হ'লে সেই ফুটো দিয়ে জিনিষটা ঘিয়ের ওপর পড়তে থাক্‌বে। প্রথমত একটা গোলাকার

রেখার মত করে ফেল। তারপর সেই রেখাটার উপর বাঁ দিক হতে ডান দিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে জিনিষটা ফেল্‌তে থাক। জিলিপির গোলরেখা ও তার উপর প্যাঁচের মতন যেটা হয় তা তোমরা সকলেই দেখেছ। আমি যে ভাবে লিখ্‌লুম, সেই ভাবে ঐ জিনিষটা তৈরী হবে।

অবশ্য ন্যাক্‌ড়ার পুঁটলীটার ভেতরকার জিনিষ ফুরুলে আবার আধপো আন্দাজ তাতে দিয়ে নেবে।

একখানি তাওয়ায় একবারে মধ্যম সাইজের ৫।৬ খানি তৈরী হবে। এক পিঠ ভাজা হোলে একটা বাঁশের কাটি দিয়ে উল্‌টিয়ে দিতে হবে। যখন তাওয়ার ঘিয়ের উপর প্রথম ছাড়্‌বে, তখন জিনিষটার রংটি থাক্‌বে সাদা, তারপর সামান্য লাল্‌চে রং হোলেই ভাজা শেষ হ'ল বুঝতে হবে।

ঐ পরিমাণ জিনিষের জন্য—অর্থাৎ একসের মুগ দাইল, একপো এরারুট ও পাঁচপো ঘিয়ের বরাদ্দে ৩½ সের সাফ চিনির দরকার, তা দিয়ে রস প্রস্তুত কর্‌বে।

রস প্রস্তুত করার নিয়ম—সাড়ে তিন সের চিনিতে একসের জল দিয়ে উনুনের উপর জ্বাল দিতে থাকবে। আর একটা পাত্রে দুইসের জল ও আধপো দুধ মিশিয়ে রাখবে।

উনুনের উপর চিনি উথ্‌লে উঠ্‌লে—অপর পাত্র হোতে দুধের জল এক এক বারে অল্প-পরিমাণে তাতে দিতে হবে। তা হ'লে রসের ওপর গাদ জম্‌বে—ঝাঁজ্‌রা দিয়ে সেই গাদ তুলে ফেল্‌তে হবে। ক্রমাগত কয়েক বার, অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত সেই দুইসের দুধের জল নিঃশেষ না হয়, এবং চিনির রস খুব পরিষ্কার না হয়—সে পর্য্যন্ত সেই দুধের জল দিয়ে দিয়ে ঝাঁজ্‌রায় কোরে গাদ তুলে ফেল্‌তে হবে।

যখন আঙ্গুলে কোরে দেখবে যে রস একটু আঠা আঠা হয়েছে—তখন বুঝ্‌বে রস ঠিক হয়েছে।

এখন সেই অমৃতি বাঁশের কাঠিটিতে কোরে তুলে নিয়ে চিনির রসে ফেল। কিছুকাল রসে রাখ্‌লে অমৃতি বেশ, নরম হবে—তখন ঝাঁঝ্‌রায়

কোরে তা' তুলে রাখ। পূর্ব্বোক্ত পরিমাণে জিনিষে মধ্যমাকৃতি ৪০।৪৫ খানি ভাল অমৃতি তৈরী হবে।

বাজারে অমৃতি যে ভাবে প্রস্তুত হয়, তার চাইতে এতে দাম একটু বেশী পড়বে—তার কারণ হচ্ছে, বাজারে ঘি ভাল দেয় না এবং সেই খারাপ ঘিয়ের সঙ্গে বাদামের তেল প্রভৃতি নানারূপ তেল চালিয়ে থাকে।

ক্ষীর মোহন

একসের ভাল ছানার সঙ্গে একপোয়া ভাল ডেলা ক্ষীর (মেওয়া) একখানি কাঠের বারকোসের উপর রেখে খুব ভাল ক'রে ডলে ফেল। তার সঙ্গে একছটাক সুজি মেসাও এবং ফের্ ডল। এই জিনিষটা তৈরী হ'লে তা' দিয়ে এক এক ছটাক পরিমাণ গুলি প্রস্তুত কর। তার পর শুধু ক্ষীর ও ঘি মিশিয়ে ছোট ছোট দানার

কতকগুলি গুলি প্রস্তুত কর এবং সেগুলির এক একটি আগের তৈরী একছটাক ওজনের বড় গুলির এক একটির ভেতর পুরে ফেল।

চার সের চিনির রস পূর্ব্বোক্ত ভাবে (অর্থাৎ অমৃতি তৈরী করার জন্য যেরূপ বলা হয়েছে সেই ভাবে) প্রস্তুত কর। কিন্তু এই রস খুব পাৎলা হবে। ৪ সের চিনিতে ৪ সের জল দিয়ে উনুনের উপর জ্বাল দিয়ে এই রস তৈরী করতে হবে। পূর্ব্বে যে ভাবে বলা হয়েছে সেই ভাবে এবারও গাদ কাটতে হবে।

এই ভাবে প্রস্তুত হ'লে রস দুইভাগে পৃথক ক'রে ফেল। তার দশ আনি একটা কড়াতে ভিন্ন ক'রে রেখে দাও। আর ছয় আনি উনুনের উপর থাকুক।

পূর্ব্বে যে গোল্লা তৈরী হয়েছে—(অর্থাৎ বড় এক ছটাক ওজনের গুলির মধ্যে পোরা ছোট ছোট গুলি)—সেই গুলির ৭।৮ টি কোরে এক একবারে উনুনের উপর রসের মধ্যে ফেলতে হবে। রসে

ফেল্লে উথ্‌লে উঠে গোল্লাগুলি ডুবে যাবে। ৩।৪ মিনিট পরে একটু জল সেই রসের উপর ছিটিয়ে দাও। তাতে রসের ফেনা কেটে যাবে। এখন গোল্লাগুলির উপর যখন ফুটোর মত ছোট ছোট দাগ হবে—তখন বুঝ্‌বে সেগুলির পাক শেষ হ'য়ে গেছে, তখন উনুনের উপরকার গরম রস হোতে নাবিয়ে নীচেকার পাত্রের অপর-ভাগ রসে সেগুলি ফেল্লে তা' ক্ষীর-মোহন হবে।

"পরেটা"

যে মাল মস্‌লার ফর্দ্দ দেওয়া যাচ্ছে, তাতে ১০ খানি ঢাকাই পরেটা তৈরী হবে।

মিহি ময়দা—আধসের।

আধ ছটাক ঘি দিয়ে সেই আধসের ময়দা মেখে নিতে হবে।

ভাল ক'রে সেই ঘিয়ের ময়ান হ'লে ফের জল দিয়ে ভাল ক'রে মাখ্‌তে হবে। মাখা শেষ

হ'লে সেই ময়দায় দশটা ডেলি তৈরী করবে। এক একটা ডেলি চাকির ওপর ভাল ক'রে বেলতে থাক। একবার বেলা হ'লে তারপর ঘিয়ের হাত বুলিয়ে দাও। তারপর সেই গোলাকৃতি জিনিষটার ঠিক মাঝখান হোতে একধার পর্য্যন্ত সোজা ক'রে কাট। এবং ঐ কাটা অংশটা ধোরে ক্রমে গুটুতে থাক। গুটুনো শেষ হ'লে দেখবে যে ঐ জিনিষটা একটা বড় পানের খিলি বা মোচার আগার মত দেখাবে। সেই জিনিষটার মাথায় আঙ্গুল টিপে চেপ্টা ক'রে বসিয়ে দাও। এই অবস্থায় উহা পুনরায় একটা ডেলির মত হ'বে—তার ভেতর অনেক ভাঁজ থাকবে। এই ডেলিটাকে পুনরায় বেলে পুরু লুচির মত কর।

এক খানা বড় চাটুতে এক ছটাক ঘি জ্বাল দাও। ঘি এলে—কাঁচা লুচির আকৃতি জিনিষটা আস্তে আস্তে ঘিএর মাঝে ফেল। তারপর উহা খুন্তি দিয়ে উল্টিয়ে দাও। এই জিনিষের কোন জায়গায় ফুলে না ওঠে, সেই দিকে লক্ষ্য

রাখ্‌তে হবে, এবং তজ্জন্য চাপা দেওয়া যায় এমন একটা কিছু দিয়ে চেপে চেপে দাও। রিলের সূতোর যে কাঠটা থাকে সেই রকম একটা কিছু দিয়ে ঘুরিয়ে চাপ দিতে হবে। জিনিষের রং একটু লাল্‌চে হোলে নাবিয়ে নিয়ে তাকে অনায়াসে পরেটা ব'লে পরিবেশন করতে পারবে।

"গজা"

মাল-মসলা ২০ খানি গজার মত।

আধসের ময়দা আধ ছটাক ঘি দিয়ে বেশ করে ড'লে নিতে হবে। তারপর আবার জল দিযে নেবে, ঠিক পরেটার সময় যেরূপ করেছ।

এই মাখা ময়দাটায় ২০টি ডেলি তৈরী কর। তারপর চাকির উপর রেখে বেলনা দিয়ে জিভের আকৃতি কর। এক একটা জিভেতে সমান

ব্যবধানে তিনটে ফুট কর। আধসের ঘি কড়াতে ক'রে জ্বাল দাও। ঘি এলে ঐ জিভ ৩।৪ টা করে ফেল।

পাঁচপো চিনির সঙ্গে একসের জল মিশিয়ে জ্বাল দাও। রস খুব গাঢ় কর। হাতা দিয়ে ঘুটলে রসটা অনেকটা গাঢ় হবে। এই রসের ভিতর, আগে যে জিভ তৈরী করেছ, সেগুলি ছেড়ে দাও। ছেড়ে দিয়ে চলে যেও না, অমনই উঠিয়ে নাও। ঠাণ্ডা হোলে খেতে দিও, নইলে 'জিভে গজা' খেয়ে জিভ পুড়্‌বে।

গ্রন্থকার-সম্পাদিত

সচিত্র

১। কৃত্তিবাসী রামায়ণ

পঞ্চম সংস্করণ মূল্য ৪৲ চারি টাকা।

২। কাশীদাসী মহাভারত

ষষ্ঠ সংস্করণ মূল্য ৬৲ ছয় টাকা।

উভয় পুস্তকই বহু চিত্রে পরিশোভিত। উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে বড় বড় অক্ষরে ছাপা। পুস্তক দুইখানি বঙ্গ প্রেসিডেন্সীর ডিরেক্টার বাহাদুর কর্ত্তৃক লাইব্রেরী ও প্রাইজের জন্য অনুমোদিত।

৩। কৃষ্ণকমল গ্রন্থাবলী

মূল্য ২৲ দুই টাকা।

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্
[illegible]নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা